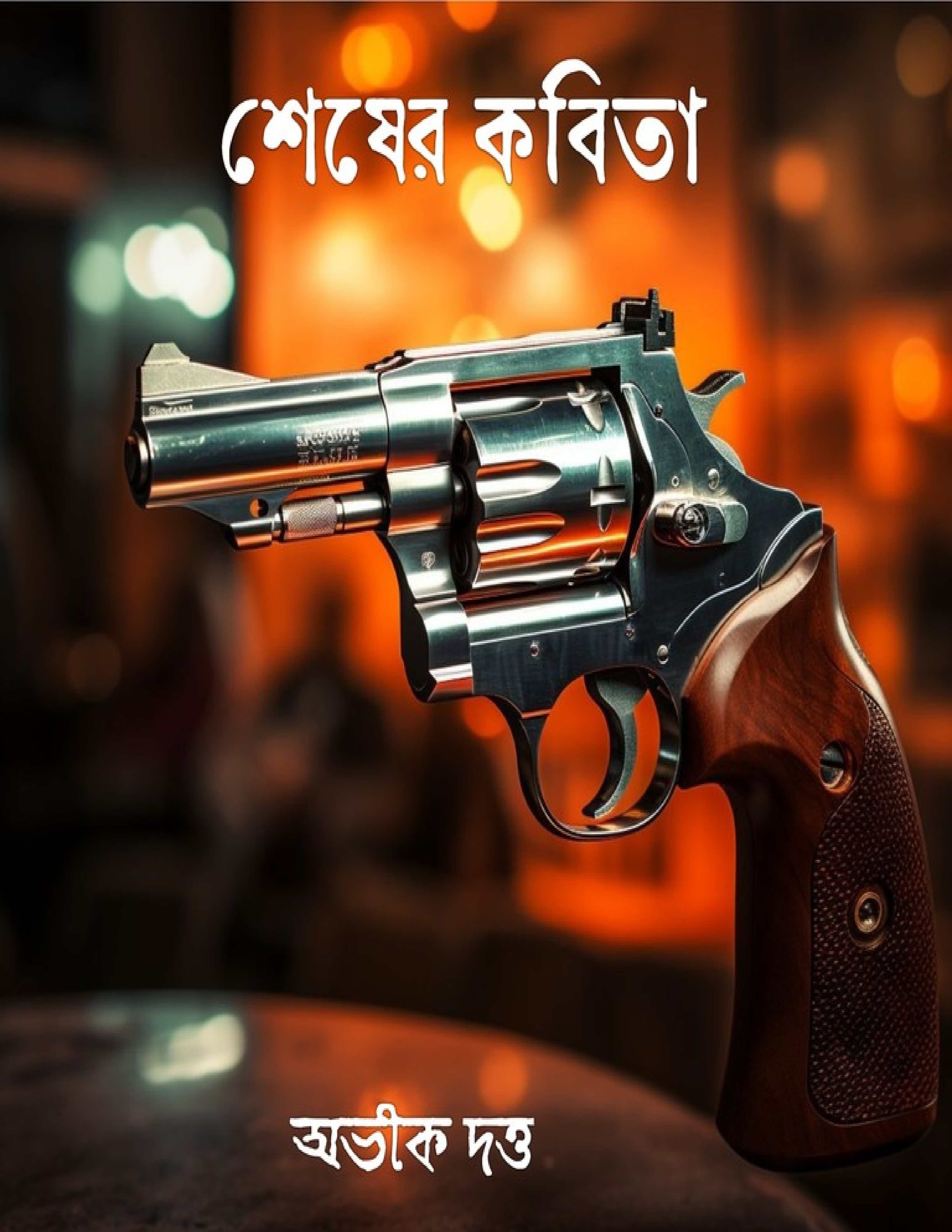
শেষের কবিতা



অভীক দত্ত

শেষের কবিতা

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

শেষের কবিতা

অভীক দত্ত

(এই উপন্যাসের চরিত্র, স্থান কাল পাত্র, সব কাল্পনিক। বাস্তব কোন ঘটনার সঙ্গে এর কোন মিল নেই)

https ://iwrite.app

উৎসর্গ- আমার ভীম দাদা সুজয় দত্তকে

সূচিপত্র

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

১।

"এই মুহূর্তে সব থেকে বড় ব্রেকিং নিউজ। খুন হয়েছেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। নিজের ঘরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, রবি সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন তার মৃত্যুর সময় যেন "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন" গানটা বাজে। তার মৃতদেহ উদ্ধারের সময় তার মোবাইলে ঠিক এই গানটাই বাজছিল। শিল্পীকে তার শয়নকক্ষে নৃশংসভাবে কপালে গুলি করে খুন করা হয়েছে। শিল্পীর প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত"।

...

ফুলগুলো টেবিলের ওপরেই রাখা। মিষ্টির প্যাকেটটাও। তিরিশে সেপ্টেম্বর আজ। খানিকক্ষণ আগে তার ফেয়ারওয়েল হয়েছে। আগামীকাল থেকে তার মুক্তি। চোখ খুলে ফুল আর মিষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কী অদ্ভুত একটা সময় আসে মানুষের জীবনের। সব কিছু থেকে বিদায় নিতে হয়। তার রিটায়ারমেন্ট? হয়ে গেল? এই তো সেদিন জয়েন করলেন। কত কাজ শেখা! বিশ্বাস সাহেব ক্রিমিনাল সাইকোলজি বোঝাতেন গল্পের মত করে। একজন ক্রিমিনাল কেন খুন করবে? খুন মানে কী?

কোন কোন ক্ষেত্রে খুন হল অপরাধের শেষ পর্যায়। এক একটা ধাপ পেরিয়ে আসে। সব ধাপের পরের ধাপ হল মানুষের মৃত্যু। একটা মানুষ আরেকজনকে খুন করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের একটা গ্রামে তার আত্মীয়স্বজন আছে। কেউ যদি বাইরে চলে যায়, তাহলে তার মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "আরেকজন হিন্দু কমে গেল"।

একেকজন মানুষ, এক এক জন করে দলবদ্ধ হয়। আবার একেকজন মানুষ, আরেকজনকে মেরে ফেলার আগে দুবারও ভাবে না।

এ বিষয় কি একদিনে বুঝে ওঠা সম্ভব?

নাহ! কিছুতেই সম্ভব না।

ফোনটা বাজছে।

তিনি অভ্যস্ত হাতে ফোনটা তুললেন, "বোস হিয়ার"।

"উপমন্যু, আমার চেম্বারে আসবেন একবার?"

বসাক সাহেব।

"শিওর স্যার"।

ফোন রেখে বসাক সাহেবের চেম্বারের দরজায় টোকা মেরে দরজা খুলে প্রবেশ করলেন তিনি।

বসাক তাকে দেখে বললেন, "অরুণ মুখার্জির খবরটা শুনেছেন?"

উপমন্যু বললেন, "নাহ। কী হয়েছে?"

বসাক বললেন, "আপনি ফেয়ারওয়েলে বিজি ছিলেন। এই তো কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোকের লাশ পাওয়া গেছে, নিজের ঘরে। কপালে গুলি করেছে। ভাবুন"।

উপমন্যু শুধু বললেন, "প্যাথেটিক"।

বসাক বললেন, "কথাটা সেটা না। কথাটা হল আমাকে উপরমহল থেকে ফোন করে নির্দেশ দেওয়া হল, কেসটা যেন আপনাকে দেওয়া হয়"।

উপমন্যু ভ্রূ কুঁচকালেন, "আমাকে? আমি আজ রিটায়ার করলাম স্যার"।
বসাক বললেন, "বাড়ি বসে থাকবেন? আজ না হয় বাড়ি যাবার পথে একবার দেখে যান"।
উপমন্যু বসাকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এত বিখ্যাত ছিলেন?"
বসাক বললেন, "ওর প্রাক্তন স্ত্রী বিখ্যাত। ওর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাটাও কুখ্যাত বা বিখ্যাত। আপনার রক্ত ফুটছে না উপমন্যু? আপনার মত লোক কী করে এত সব কিছু শোনার পরেও উত্তেজিত হচ্ছেন না?"
উপমন্যু হেসে ফেলে বললেন, "লাশ পোস্টমর্টেমে গেছে?"
বসাক মাথা নাড়লেন, "ইয়েস। গেছে"।
উপমন্যু বললেন, "ও বাড়িতে কে কে থাকে?"
বসাক বললেন, "কেউ না। উনি একা থাকতেন। একাধিক নারী সঙ্গ ছিল"।
উপমন্যু বললেন, "নারী সঙ্গের খবরটা কে বলল আপনাকে?"
বসাক বললেন, "খবরেই তো বলে যাচ্ছে। এখন সেলেবযুগ। এক্স ওয়াই এর সঙ্গে প্রেম করছে খবর, ওয়াই এক্সকে ছাড়তে পারছে না জেড এক্সকে দখল করে ফেলছে। সেটা নিয়ে চর্চা হল কী হল না, আরেকটা বিচ্ছেদের খবর এসে বাজার গরম করে দিচ্ছে। হারিত লারিত জারিত কেসগুলোয় আপনি সেরা বস, আপনি না দেখলে ডিপার্টমেন্ট কানা হয়ে যাবে, বুঝছেন না কেন? লাহিড়ী সবে জয়েন করেছে। আপনি ওকে নিয়ে যান। প্লিজ বোস, উপরওয়ালা বেস্ট লোক বলছে, আপনি ছাড়া বেস্ট কে আছে?"
উপমন্যু বললেন, "আমাকে কি শান্তিতে রিটায়ারও করতে দেবেন না"?
বসাক বেল বাজালেন, পিওন ঘরে এসে ঢুকতেই বললেন, "লাহিড়ীকে পাঠাও"।
বসাক টিভি চালালেন। টিভিতে বলে চলেছে, "তার অ্যালবাম "জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে", "আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে", "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন", প্রতিটির বিক্রি বেড়ে গেছে। ডাউনলোড বাড়ছে... কে মারলেন অরুণ মুখার্জিকে? কেন মারলেন? তার স্ত্রী ঋতুপর্ণা মুখার্জি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কেন? আমাদের সাংবাদিক অতনু এই মুহূর্তে ঋতুপর্ণার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কত উঁচু ফ্ল্যাটে থাকেন ঋতুপর্ণা। ঋতুপর্ণা আপনি ঘরে দরজা এঁটে বসে থাকতে পারেন না। দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া, ঋতুপর্ণা আপনি কি বলতে চাইছেন আপনার বড়ই জ্বর? তা হতে পারে না। আপনাকে কিছু বলতেই হবে। আপনার হাজব্যান্ডকে আপনি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছিলেন। আপনারা দেখতে পারছেন দর্শকেরা, আমাদের চ্যানেলেই ঋতুপর্ণার ফ্ল্যাটে ওর আগের একটা ইন্টার্ভিউ। ঋতুপর্ণার ঘরের ভিতর রবীন্দ্রনাথের বড় একটা ছবি। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবি রেখেছেন কেন? তাহলে কি স্বামীর রবীন্দ্রগান তার মনে প্রভাব ফেলেছিল? গান প্রভাব ফেললে স্বামীকে ফাঁসালেন কেন তিনি? সানশাইন কাচ্চি ঘানি সর্ষের তেল প্রযোজিত কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল অরুণ মুখার্জিকে? আজ রাত আটটায়। ঘণ্টা খানেক সঙ্গে আমি... আমি জানাবো কাদের উপর সন্দেহ করা হচ্ছে। কে মেরেছে? আমি জানাবো প্রিয় দর্শক..."
উপমন্যু বললেন, "এই তো স্যার, আমাকে কী দরকার? এরাই আছে তো!"
লাহিড়ী চেম্বারে নক করলেন, বসাক বললেন, "এসো"।
লাহিড়ী প্রবেশ করলেন।
বসাক বললেন, "উপমন্যু দেখবেন কেসটা। ওকে নিয়ে যান"।
লাহিড়ী অবাক চোখে উপমন্যুর দিকে তাকালেন।
উপমন্যু কাঁধ ঝাঁকালেন, "ঢেঁকি হয়ে গেছি। তবে বসাক সাহেব মনে হয় আমাকে স্বর্গে যেতেও দেবেন না। এখানেই ধান ভাঙতে হবে। চলুন"...

২।

।।পূর্ব কথা।।

।।চার বছর আগে।।

ড্রইং রুমে অরুণের ছাত্র ছাত্রীরা এসেছে।

বেডরুমে ঋতু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন। বেরোতে হবে। একটা স্ক্রিণ টেস্ট আছে। বড় ব্যানারের কাজ। তার আর শালিনীর মধ্যে যে কোন একজনকে নেওয়া হবে। রথীন অবশ্য হোয়াটস অ্যাপে ইঙ্গিতটা দিয়ে রেখেছে। ঋতুর দিকেই পাল্লা ভারী। টেনশনটা অন্য। শালিনীর একটা পলিটিকাল হোল্ড আছে। সেটা কাজ করতে শুরু করলে ঋতুকে নাও নিতে পারে। ঋতু অবশ্য অতো ভাবতে রাজি নন এখন। যে করেই হোক টেস্টটা ভাল করে দিতে হবে। কাজ ভাল হলে তখন পলিটিকাল হোল্ড থেকেও কোন লাভ হয় না। যে কোন দিন শালিনীর থেকে তিনি অনেকখানি এগিয়ে থাকবেন। ঋতু আয়নায় নিজেকে দেখে হাসলেন। শালিনী কেন, তার দিনে কেউ তাকে হারাতে পারবে না। তিনিই সেরা। কাজটা করা শুরু করুন, যে কেউ তার সামনে এলে উড়ে যাবে। কেউ টিকতে পারবে না। প্রশ্নই আসে না।

দরজায় নক হচ্ছে। ঋতু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নক শুনে দরজা খুললেন। অরুণ গম্ভীর মুখে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

ঋতু বললেন, “কী হল? দরজা বন্ধ করলে কেন?”

অরুণ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে খাটে বসলেন। ঋতু বিরক্ত গলায় বললেন, “সিগারেটের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। কেন স্মোক করছো? তুমি তো জানো আমার কী প্রবলেম হয়?”

অরুণ বললেন, “পৃথ্বী একটা ছবি পাঠালো হোয়াটস অ্যাপে”।

ঋতু বললেন, “হ্যাঁ, কী ছবি?”

অরুণ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, “তুমি এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলো?”

ঋতু বললেন, “কেন বল তো”?

অরুণ বললেন, “তুমি বলেছিলে বাড়ির শালীনতা বজায় রাখবে। ভদ্র বাড়ির বউয়ের মত থাকবে। তা তো তুমি থাকছো না”।

ঋতু বললেন, “আমি অভিনয় করি। তুমি সেটা খুব ভাল করে জানো। আমি বাড়ি থেকে যে ড্রেস পরে বেরবো, সে ড্রেস পরে অভিনয় করব? তুমি জানো না ওখানে কী ড্রেস পরতে হতে পারে? সেটা নিয়ে ইস্যু ক্রিয়েট করছো কেন?”

অরুণ বললেন, “ইস্যুর তো কিছু নেই। আমি পারমিশন দেবো না সেক্ষেত্রে। তুমি যাবে না”।

ঋতু বললেন, “কোথায় যাবো না?”

অরুণ বললেন, “ওই বেশ্যাবৃত্তি করতে”।

ঋতু থমকে গেলেন। অরুণের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “এই ভাষাটা ব্যবহার করলে কেন তুমি?”

অরুণ বললেন, “বেশ করবো। আমি চাই না তুমি জামা কাপড় খুলে ওসব কর। তোমাকে সংসার করার জন্য বিয়ে করেছি। যেভাবে আর পাঁচটা মেয়ে সংসার করে, সেভাবে সংসার কর”।

ঋতু বললেন, "আমি তোমার পোষা ক্রীতদাস নই। সুতরাং এসব কথা অন্য কাউকে বোল। আমি যাবো যখন বলেছি, তখন আর দ্বিতীয় কোন কথা আমি শুনতে রাজি নই"।

অরুণ জ্বলন্ত সিগারেটটাই ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "ওয়েল, দেন গো টু হেল। যে বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা হয়, সে বাড়ির বউ বাইরে গিয়ে ছেনালি করে আসবে, তা তো হয় না"।

ঋতু রাগের মাথায় রীতিমত কাঁপছিলেন। অরুণ ঋতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, যেখানে যাবে যাও, বাবুদের সামনে কাপড় খুলে দাঁড়াও। টাকা ছুঁড়ে মারবে তারা তোমার শরীরে। তোমার তাতেই তো অর্গাজম হবে, তাই না? তুমি আর এ বাড়ির বউ কেন হবে? তুমি হলে বারোয়ারি মাল। বারো লোকে তোমায় চেটে পুটে খাবে"।

ঋতু দুহাতের তর্জনী দিয়ে কান চাপা দিয়ে বললেন, "তুমি প্লিজ যাও। আমি নিতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি কোথাও যাবো না। ঘরে থাকবো"।

অরুণ যুদ্ধজয়ের হাসি হেসে বললেন, "তবে? দেখলে তো? কড়া ওষুধ দিলে কেমন সহজে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়? এটা কি অতো কঠিন ছিল? যাক গে, আমি ক্লাসে গেলাম। তুমি একটু গড়িয়ে নাও। বিকেলে না হয় আমরা কোন হলে গিয়ে একটা মুভি দেখে আসবো?"

ঋতু দুহাতে মাথা চেপে বসে রইলেন।

অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যাগের ভেতর থেকে ঋতুর ফোন বাজছে। ঋতু ফোন ধরলেন না। ফোন থামার নাম নেই। বেজেই চলেছে। বিরক্ত হয়ে ব্যাগ থেকে ফোন বের করে ফোনটা ধরলেন, "কী রে? কী হয়েছে? ফোন ধরছিস না কেন?"

রথীনদা। অধৈর্য হয়ে ফোন করেছে।

ঋতু বললেন, "এই তো ওয়াশরুমে ছিলাম। বল কী বলবে"।

রথীনদা বলল, "কাস্ট ফাইনাল হয়ে গেছে। তোকে আর টেস্ট দিতে হবে না"।

ঋতু বললেন, "মানে?"

রথীনদা বলল, "তোকেই ফাইনাল করা হয়েছে। তোকে জানিয়ে দিতে বলল। শিডিউল, স্ক্রিপ্ট সব মেইল করা হবে। খাইয়ে দিস কিন্তু, পার্টি চাই"।

রথীনদার গলায় উল্লাস।

ঋতু ক্লান্ত হাতে ফোন কেটে দিলেন। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া সময় চলে এসেছে...

৩।

।।বর্তমান সময়।।

"স্যার, অরুণ কুমারের গান শুনেছেন?"

লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলেন। গাড়ি চলছে। তারা অরুণ কুমারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। শুনেছি। ভালোই লাগতো। আমার সবার গানই ভাল লাগে। আমি তো ভেবেছিলাম এবার সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকবো আর গান শুনবো। স্যার তার সুযোগ দিলেন না"।

লাহিড়ী হাসলেন, "সে আপনি যাই বলুন। আমরা জুনিয়ররা জানতাম আপনাকে এত সহজে ছুটি দেবে না। ডিপার্টমেন্টের আপনাকে দরকার"।

উপমন্যু ক্লান্ত চোখে জানলার বাইরে তাকালেন। খুব একটা খারাপও তার লাগার কথা না। কী করবেন বাড়িতে বসে সারাক্ষণ ধরে? বরং কোন কিছুতে ব্যস্ত থাকলে কাজের কাজ হবে। বাড়িতে থাকলে শরীর বসে যাবে। মরেও যেতে পারেন। ডিপার্টমেন্টে ছিলেন অমরদা, হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন। কেউ কেউ বলে লং কোভিডে মারা গেছেন। কার কথাই বা শুনবেন? কে যে ঠিক বলছে, তা কেউই জানে না। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। আজ আছে, কাল নেই। ঘরে বসে থাকার থেকে কাজে ব্যস্ত থাকাই ভাল।

বললেন, "অরুণ কুমারের বাড়ির ডিটেলস কিছু নিয়েছ?"

লাহিড়ী বললেন, "বাড়িতে কেউ থাকতো না। কাজের লোক এসে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। বলছে একটা গানই বেজে যাচ্ছিল"।

উপমন্যু বললেন, "কাজের লোক আর কী বলেছে? কে কে আসতো?"

লাহিড়ী বললেন, "সে থাকাকালীন তেমন কেউ আসে নি। তাও আপনি একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবেন। আমি থাকতে বলেছি"।

উপমন্যু বললেন, "ঠিক আছে। ফরেনসিকের কাজ ঠিক করে হয়েছে তো?"

লাহিড়ী বললেন, "হ্যাঁ। তাপস রায়দা দেখছেন কেসটা। আপনি কথা বলে নিতে পারেন"।

উপমন্যু বললেন, "দেখছি কী করা যায়। আপাতত বাড়ি সিল করে দেওয়া হোক। আমরা ছাড়া কেউ ঢোকে না যেন"।

লাহিড়ী বললেন, "সেটা করে দিয়েছি স্যার"।

উপমন্যু খুশি হলেন, "গুড জব। উত্তরসুরিরা যথেষ্ট রেসপন্সিবল দেখে ভাল লাগছে"।

লাহিড়ী বললেন, "কী যে বলেন স্যার। এটা তো রুটিন"।

উপমন্যু বললেন, "এই রুটিন কাজটাই কতজন করে না আজকাল। বার বার উপরের ডিসিশনের জন্য বসে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে একজন অফিসারের। নইলে সমস্যায় পড়ে যাবে। যাক গে, অরুণ কুমারের বাড়িতে কেউ থাকে না মানে কী? বাবা মা দুজনেই মৃত?"

লাহিড়ী বললেন, "হ্যাঁ। পৈত্রিক বাড়িতে একাই থাকতেন ভদ্রলোক। ঋতুপর্ণার সঙ্গে ডিভোর্সের পর আরও একা হয়ে গেলেন। তবে একবারে নারীসঙ্গ বিবর্জিত ছিলেন, ব্যাপারটা সেরকম নয়। এই মুহূর্তে দুজন মহিলার নাম জানা গেছে, যাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল"।

উপমন্যু বললেন, "ফোন পাওয়া গেছে তো। চ্যাট ট্রান্সক্রিপ্ট উদ্ধারের জন্য দিয়ে দাও"।

লাহিড়ী বললেন, "সেসব শুরুতেই করে দেওয়ার ইন্সট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যের মধ্যে মেইল করে দেবো আপনাকে"।

উপমন্যু বললেন, "চ্যাট থেকেই দুজন মহিলার নাম জেনেছ নাকি?"

লাহিড়ী বললেন, "হ্যাঁ। রীতিমত রগরগে ব্যাপার আর কী"।

উপমন্যু বললেন, "রগরগেটা কেন বললে? এই টার্মটা ইউজ না করার চেষ্টা কর। একবারে নিরপেক্ষ জায়গা থেকে বিচার করে দেখো, একজন কী পরিস্থিতিতে আরেকজনের সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে? একাকীত্ব থেকে করতে পারে, হতাশা থেকে করতে পারে। বা যেভাবেই করুক, শুরু থেকেই আমরা সেটাকে কোন একটা বিশেষণ দিয়ে দাগিয়ে দেবো না"।

লাহিড়ী বললেন, "ঠিক স্যার। মাথায় থাকবে"।

অরুণের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। বাড়ির নাম "শেষের কবিতা"।

গেটের বাইরে মিডিয়া দাঁড়িয়ে আছে। উপমন্যুকে নামতে দেখে সবাই ছুটে এল।

সি নিউজের অনামিকা বলল, "স্যার, আপনাকে স্পেশাল এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে এই কেসটার জন্য, আপনি কি সেটা অ্যাক্সেপ্ট করেছেন?"

উপমন্যু বললেন, "সবই তো তোমরা জেনে গেছো। অ্যাক্সেপ্ট করেছি নাকি সেটাও নিশ্চয়ই জানো। আর আমাকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করছো কেন?"

অনামিকা বলল, "প্লিজ স্যার, এটাও তো একটা নিউজ"।

উপমন্যু বললেন, "পরে দেখছি। আপাতত আমাদের কাজ করতে দাও"।

সংবাদপত্রের পুষ্পল বাড়ির প্রাচীরের ভেতরে ঢুকে গেছিল, তাকে বের করা হল। উপমন্যু শ্বাস ছাড়লেন।

এতক্ষণে কে খুনী, এরা তাও একটা কিছু ঠিক করে মিডিয়া ট্রায়ালও শুরু করে দিয়েছে নির্ঘাত, সঙ্গে লাহিড়ীর ভাষায় "রগরগে কাহিনি", খবর বিক্রির সঙ্গে তার অবসরের দিনটাও সুন্দর বিক্রি হবে।

এই আগ্রাসন জয়েনিং- এর দিন ভাবতে পারেন নি।

লাহিড়ীকে নিয়ে অরুণের বাড়িতে ঢুকলেন তিনি।

লাহিড়ী একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই যে স্যার, এখানেই..."

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ড্রইং রুমের বাঁ দিকের দরজা খুললে এই ঘরে আসা যায়। ঘরের অন্য কোন প্রবেশ পথ নেই। একটাই। যে খুন করেছে সে এই ঘরে ঢুকে খুন করে গুলি চালিয়ে তারপর একই পথে বেরিয়েছে।

উপমন্যু বললেন, "পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসুক। লাশ উদ্ধার কখন হয়েছে?"

লাহিড়ী বললেন, "বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। ঠিকে কাজের মেয়েটা এসে দেখছে দরজা খোলা, মেঝের উপর উনি পড়ে আছেন, আর গান বাজছে মোবাইলে..."।

উপমন্যু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটা দেখতে দেখতে বললেন, "অরুণবাবুর রিসেন্ট অ্যালবামের সেলস রিপোর্ট?"

লাহিড়ী বললেন, "হতাশাজনক। চলে নি। কোন সিনেমাতেও প্লে ব্যাক পাচ্ছিলেন না আজকাল। প্রোগ্রাম কয়েকটা পাচ্ছিলেন, অত্যধিক মদ খাবার জন্য পরে সেগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। কিছু ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙেছিলেন শেষের দিকে"।

উপমন্যু বললেন, "একাকীত্ব লাহিড়ী, একাকীত্ব। ভয়াবহ একটা জিনিস। ভয়াবহ। এ বাড়িতে সিসিটিভি নেই। রাস্তায় কিছু আছে?"

লাহিড়ী বললেন, "না। মোড়ের মাথায় আছে। এ বাড়ির সামনে কিছু নেই"।

উপমন্যু বললেন, "তাতেও হবে"।

বাড়ির বাইরে হৈ হৈ শোনা যাচ্ছে। উপমন্যু বললেন, "কী হল আবার?"

লাহিড়ী বেরিয়ে দেখে এসে বলল, “ঋতুপর্ণা এসেছেন। হয়ে গেল স্যার”।

উপমন্যু বললেন, “হবে কেন? ভালই হয়েছে। কয়েকটা প্রশ্ন করে নি। নইলে আবার ওর বাড়ি যেতে হত”।

লাহিড়ী বললেন, “ওর এখানে আসা কি ওর উপর থেকে সন্দেহের তীর যাতে সরে যায়, তার চেষ্টা”?

উপমন্যু হাসলেন, “হতে পারে। নাও হতে পারে। আগে থেকেই আমরা কিছু ভাবব না। রাইট?”

লাহিড়ী বললেন, “রাইট স্যার”।

৪

"মিডিয়া ট্রায়াল= মিডিয়া নিজেই ঠিক করে ফেলে কে দোষী। নিজেদের মত গল্প পরিবেশন করতে শুরু করে দেয়। কখনো এটা প্রোপাগান্ডা তৈরির জন্যও করা হয়। কোন রাজনৈতিক দলের ফান্ড থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত মিডিয়া যখন এই কাজ করে, তখন সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়"।

নোটপ্যাডে এটুকু লিখে চুপ করে বসে আছেন উপমন্যু। পিয়ালী রুটি তরকারির প্লেটটা তার সামনে দিয়ে বললেন, "খেয়ে নাও। শিগগিরি খাও, নইলে দেখা যাবে আবার ফোন এসে গেছে। তুমি আবার দৌড়বে। কোথায় ভাবলাম আজ অন্তত নিস্তার পাবে!"

উপমন্যু হাত ধুতে উঠলেন। সময় নিয়ে হাত ধুতে হয় আজকাল। মাঝে মাঝে মনে হয় তার হাতেও রক্ত লেগে আছে। চাকরিতে ঢোকার প্রথমদিকে এরকম হত। কোন লাশ দেখে এলে খেতে পারতেন না। অনেক কষ্টে সে জিনিস সেরেছে।

এতদিন ছিল না।

দিন কয়েক হল সে জিনিস ফিরে এসেছে। এখন আবার সেরকম মনে হয়।

হাত ধুয়ে টেবিলে বসে বললেন, "অরুণ মুখার্জির গান শোন?"

পিয়ালী বললেন, "না। শুনি না। তোমার মাথায় এবার অরুণ মুখার্জি ঢুকে গেছে, না?"

উপমন্যু আর কোন কথা না বলে চুপ করে খেতে শুরু করলেন। পিয়ালী টিভি চালালেন। সঞ্চালক বেশ রসিয়ে রসিয়ে অরুণ-ঋতুর ডিভোর্স বর্ণনা করছে।

পিয়ালী টিভি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "দয়া করে জানিয়ে দিও, নৈনিতাল যাওয়াটা হবে নাকি। মেয়েটা অনেক আশা করে আছে"।

উপমন্যু বললেন, "কেন হবে না? ওসব নিয়ে ভেবো না। গোছ গাছ শুরু কর"।

পিয়ালী বললেন, "কী গোছাবো? একটা ভাল সোয়েটার আছে? শহরে শীত পড়ে কোথায় আর?"

উপমন্যু বললেন, "কিনবে? বেশ তো, কিনে নাও"।

পিয়ালী বললেন, "তুমি যাবে ভাবলাম। এখন নিশ্চয়ই পাবো না তোমায়?"

উপমন্যু বললেন, "কে বলেছে পাবে না? কাল যাবো নিউ মার্কেটে। সব হবে"।

পিয়ালী খুশি হলেন, "আরেকটা রুটি দি?"

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, "দাও দাও"।

ফোনটা বাজছে।

অজানা নাম্বার।

উপমন্যু ধরলেন, "হ্যালো"।

"আমি ঋতুপর্ণা বলছি অফিসার"।

উপমন্যু বললেন, "বলুন ম্যাডাম"।

"আপনি কি কোনভাবে মিডিয়াটা কন্ট্রোল করতে পারবেন? আমি আর নিতে পারছি না"।

ঋতুপর্ণার আকুতিটা আর্তনাদের মত শোনালো।

উপমন্যু বললেন, "আপনাকে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের এক্ষেত্রে হাত পা বাধা"।

ঋতুপর্ণা বললেন, “আমি দুঃখিত, আপনাকে ফোন করতে বাধ্য হলাম। আশা করি আপনি কিছু মনে করেন নি। আমার মাথা কাজ করছে না অ্যাকচুয়ালি। আমার মনে হল আপনি এ ব্যাপারে আমাকে হেল্প করতে পারবেন”।

ফোনটা কেটে দিলেন অভিনেত্রী।

‘শেষের কবিতা’য় ঢুকে সরাসরি ঘরের ভেতরে চলে এসেছিলেন ঋতুপর্ণা। অরুণের ঘরের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্বিত ফিরতে উপমন্যুকে বললেন, “খুনই?”

উপমন্যু বললেন, “আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “আমার মুম্বই যাবার কথা ছিল। সাত দিন শুট। ক্যান্সেল করব?”

উপমন্যু বললেন, “পোষ্টপন করা গেলে ভাল হয়। আপনার না থাকাটা অনেক প্রশ্ন তুলে দেবে”।

ঋতুপর্ণা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, “ওই সঙ্গীতাই ওকে খেলো। আমি জানি। স্লাট একটা। ব্লাডি বিচ”।

লাহিড়ী চমকে উপমন্যুর দিকে তাকালেন।

উপমন্যু না চমকে শান্ত গলায় বললেন, “সঙ্গীতা কে?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “সঙ্গীতা রায়। আমার সঙ্গে একটা মেগায় কাজ করেছিল। প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকতো। তখন আমাদের সেপারেশন চলছে। ওকে আমি দেখতাম কারণে অকারণে আমার সামনেই স্পিকারে অরুণকে ফোন করতো। কোন দরকার ছিল না। আমাকে দেখানোর জন্য করতো। উফ আমার মাইগ্রেন!”

ঋতুপর্ণা মাথা টিপে ধরলেন।

উপমন্যু বললেন, “আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেওয়ার ছিল ম্যাডাম। এখন দিতে পারবেন?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “কাল দিলে হবে? আমার খুব টায়ার্ড লাগছে একচুয়ালি। একটা সময় এ বাড়িতেই ছিলাম তো!”

লাহিড়ী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, চোখের ইশারায় তাকে কিছু বলতে বারণ করে উপমন্যু বললেন, “ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে কাল কথা বলে নেবো। আমার ফোন নাম্বারটা রাখুন। কোন কথা বলার থাকলে আমাকে ফোন করবেন”।

একজন ক্যামেরা নিয়ে পাঁচিল টপকেছে আবার। জানলার কাছে চলে এসেছিল। তাকে তাড়াতে হল। ঋতুপর্ণা বললেন, “আমার মিডিয়াকে ভীষণ ভয়। সব সময় ভেবেছি আমাকে নিয়ে যেন কোন দিন বিচারসভা না বসে। সেই বসে গেল। যেটা ভয় পেতাম, সেটাই হল দেখুন”।

ম্লান হাসলেন অভিনেত্রী।

উপমন্যু বললেন, “ভয় পাবেন না। আপনি দোষী না হলে ভয় পাবার বিন্দুমাত্র কোন কারণ নেই। আপনি বরং এখন চলে যান ম্যাডাম। কাল আপনার স্টেটমেন্টটা আমরা নিয়ে নেবো”।

ঋতুপর্ণা উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে বললেন, “থ্যাংকস”।

রোদচশমা পরে বেরিয়ে গেলেন অভিনেত্রী।

৫

ঘুম থেকে উঠে জানলা খুলে রাস্তার গাড়ি চলাচল দেখছিলেন উপমন্যু।

অবসরের পরের দিনের হিসেবমত মস্তিষ্ক চিন্তাহীন থাকার কথা ছিল আজ। হচ্ছে না। মস্তিষ্ক সচল রাখতে হবে। লাহিড়ী মেসেজ করেছেন তাকে সকাল সকাল তার গাড়িতে তুলে নেবেন।

ঋতুপর্ণার সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটের সামনে মিডিয়া লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের লুকিয়ে যাওয়া সম্ভব না। মিডিয়ার সামনে দাঁড়াতে তার ক্লান্তি লাগে। তিনি যা বলবেন এরা তা দেখাবে না। এরা যা শোনাতে চাইবে, শুধু সেটা দেখাবে। কত কথা বলেন, সব তো দেখায় না। অনেকটা কেটে দেয়। সমস্ত বিরক্তির উদ্রেক সেখান থেকে হয়। এদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উস্কানিতে কত সমস্যা তৈরি হয়। একটা সময় শিখেছিলেন দুটো টার্ম।

কন্ট্রোলেবল,

আন কন্ট্রোলেবল।

মিডিয়া দ্বিতীয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা বুঝবে না একজন মৃত ছেলের মায়ের কাছে গিয়ে "আপনার কেমন লাগছে?" বলাটা অনুচিতও নয়, অন্যায়।

তৈরি হয়ে বেরিয়ে দেখলেন তাতান মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরেছে। তাকে দেখা মাত্র বলে উঠল, "ঋদ্ধিমা, মণীষা মেসেজ করেছে। তোমাকে নাকি টিভিতে দেখেছে"।

উপমন্যু বললেন, "তুই দেখিসনি?"

তাতান বলল, "আমি অ্যাপে দেখে নেবো। সবই তো অ্যাপে পাওয়া যাবে। দেখবো দাঁড়াও। দেখে ফিডব্যাক দেবো তোমায়"।

উপমন্যু বললেন, "দেখতে কেমন লাগছেটা বড় ব্যাপার না রে মা। কেস সলভ করাটা বড় ব্যাপার"।

তাতান বলল, "ওটা তোমার বাঁ হাতের খেল। তুমি পারবে"।

পিয়ালী বললেন, "হ্যাঁ। সবই বাঁ হাতের খেল। বাঁ হাতের খেল দেখাতে গিয়ে বেড়াতে যাওয়া মাথায় উঠেছে, সে খেয়াল আছে?"

তাতান বলল, "দিন পনেরো হাতে আছে তো? বাবা তার আগেই কেস সলভ করে দেবে। দেখো"।

পিয়ালী উপমন্যুর দিকে ফিরলেন, "পারবে?"

গাড়ির হর্ন শোনা গেল। উপমন্যুর জুতো পরা হয়ে গেছিল। বললেন, "অর্জুনকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল কেন জানো? তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল গোটা কৌরব সেনা কতদিনে ধ্বংস করতে পারবে? যেটা গর্ব করে বলেছিল, বাস্তবে দেখা গেল সেটা হয় নি। অহেতুক অহংকার করে এসব বলার কোন মানে হয় না"।

পিয়ালী বললেন, "আমি অতো বুঝি না। নৈনিতাল মিস না হলেই আমি খুশি"।

উপমন্যু হাসতে হাসতে বেরোলেন।

লাহিড়ী ড্রাইভিং সিটে বসে ছিলেন। উপমন্যু গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে লাহিড়ী বললেন, "সঙ্গীতা রায় দার্জিলিঙে। ওয়েব সিরিজের শুট চলছে"।

উপমন্যু বললেন, "তাতে কিছু হয় না। কন্ট্র্যাক্ট কিলার দিয়ে কাজ করালে স্পটে থাকার দরকার নেই। কিন্তু খামোখা মারতে যাবে কেন?"

লাহিড়ী বললেন, "ইউটিউবে অরুণবাবুর ভিডিওগুলোর ভিউ কিন্তু বেশ ভাল স্যার। এর মানে হল ওখান থেকে ভদ্রলোকের রোজগার একটা ছিল"।

উপমন্যু বললেন, "ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আর ট্যাক্স রিটার্ন লাগবে"।

লাহিড়ী বললেন, "আজকেই পেয়ে যাবো"।

উপমন্যু বললেন, "আর মোবাইল রেকর্ডস?"

লাহিড়ী বললেন, "লজ্জাজনক স্যার। এই বয়সে সেক্স চ্যাট করতেন"।

উপমন্যু বললেন, "বয়স তো এমন কিছু ছিল না। এই বয়সটা আবার কী? ওসব ছাড়ো, কাদের সাথে করতো?"

লাহিড়ী বললেন, "র‍্যান্ডম নাম্বার। পেইড সার্ভিস ছিল"।

উপমন্যু বললেন, "এসব ব্যান না?"

লাহিড়ী বললেন, "সবই সিক্রেট ব্যাপার স্যাপার। এর মধ্যে জামতাড়া গ্যাংও আছে। লোকে একা থাকতে থাকতে এদের সব ডিটেলস অবলীলায় দিয়ে দিচ্ছে"।

উপমন্যু বললেন, "নাম্বারগুলো কোন এজেন্সী ইউজ করতো সেগুলো ট্রেস কর"।

লাহিড়ী মাথা নাড়লেন, "শিওর স্যার"।

মিডিয়ার গাড়িগুলো শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। উপমন্যুদের গাড়ি দেখামাত্র সবাই চনমনে হয়ে উঠল। তাদের গাড়ি দাঁড়াতে পারল না, সব ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উপমন্যু কাউকে পাত্তা না দিয়ে আবাসনের লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লিফটের দরজা খুলে লাহিড়ী বললেন, "তেরো তলা স্যার"।

উপমন্যু তেরো টিপে বললেন, "ফ্ল্যাট কার নামে?"

লাহিড়ী বললেন, "ম্যাডামের নামেই"।

উপমন্যু ঘাড় নাড়লেন, "ফাইন। এসো"।

৬

।।পূর্ব কথা।।

।।নষ্টনীড়।।

"বাবা আইফোন কিনেছে। আমি দুপুরে দেখেছি। গেম খেলেছি"।

প্রবল উৎসাহিত হয়ে কথাগুলো বলল সুপর্ণ। চোখ জ্বলজ্বল করছে তার।

প্রীতি বলল, "ঠিক আছে। পড়"।

সুপর্ণ আরও খানিকক্ষণ পরে বলে উঠল, "খুব ভাল ক্যামেরা ম্যাম"।

সে বলল, "তোমার মা কোথায়?"

সুপর্ণ বলল, "মা দুপুরে বেরিয়েছে। বলেছে মামাবাড়ি যাবে"।

প্রীতি বলল, "ঠিক আছে। তুমি পড়ায় মন দাও"।

সুপর্ণ আবার পড়তে শুরু করল।

গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সুপর্ণ বলল, "এসেছে। আঙ্কেল নামিয়ে দিয়ে গেল"।

মিনিট খানেক পরেই অঙ্গীরা ঘরে ঢুকল। পারফিউমের গন্ধে ঘর ম ম করে উঠল। একটা বড় ক্যাডবেরি সুপর্ণর হাতে দিয়ে বলল, "এ নে। রেখে দে। আমার ছেলে কেমন পড়াশুনা করছে প্রীতি?"

অঙ্গীরার গা থেকে পারফিউম ছাড়াও এবার মদের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। এ গন্ধটা প্রীতির সহ্য হয় না। বমি পেয়ে যায়। মাস্কটা নাকের উপর তুলে দিয়ে বলল, "করছে। চিন্তার কিছু নেই"।

অঙ্গীরা ঝুঁকে এসে ছেলের গালে চুমু খেয়ে বলল, "আমার ছেলে ইজ দ্য বেষ্ট"।

সুপর্ণ সে কথাটাই আবার বলল, "মা, বাবা আইফোন কিনেছে"।

অঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তড়িঘড়ি আলমারি খুলল। লকার ফাঁকা দেখে চিৎকার করতে শুরু করল, "শুয়োরের বাচ্চাটা আমার টাকা চুরি করেছে"।

প্রীতির অসহ্য লাগছিল। সে বলল, "আপনি প্লিজ ছেলের সামনে এরকম ভাষা ব্যবহার করবেন না"।

অঙ্গীরা আলমারি খোলা অবস্থাতেই মেঝে বসে পড়ল। দু চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তার।

প্রীতি জলের বোতলটা এগিয়ে দিল, "প্লিজ, জল খেয়ে নিন"।

অঙ্গীরা জল খেল। জোরে শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, "বউটা বেশ্যাবৃত্তি করছে, আর সে টাকায় আমার বেকার বর আইফোন কিনেছে। বলুন প্রীতি, আমি কী করবো? আপনি বলুন"।

সুপর্ণ বলল, "বেশ্যাবৃত্তি মানে কী মা?"

অঙ্গীরা কেঁদে ফেলল। মেঝেতে শুয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। প্রীতি উঠে বেরিয়ে যেতে পারতো। সুপর্ণর জন্য পারছে না। সুপর্ণও কাঁদতে শুরু করেছে। প্রীতি বলল, "আপনি একটু ঠিক হোন প্লিজ, নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে"।

অঙ্গীরা বলল, "আপনি জানেন আমি কোথায় যাই? কোথায় যেতে হয়? কী করতে হয়? জানলে এই কথাগুলো বলতেন না"।

সুপর্ণ জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল হঠাৎ করে। প্রীতি দিশেহারা হয়ে গেল। সে সুপর্ণর মাথায় তাড়াতাড়ি হাত বুলিয়ে দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা শুরু করল।

অঙ্গীরা জোরে জোরে শ্বাস ফেলা শুরু করল আবার। বলল, “টাকাগুলো জমাচ্ছিলাম, ছেলেটাকে নিয়ে অন্য একটা বাড়িতে গিয়ে উঠব। হল না। খোঁজ পেয়ে গেল। আসুক আজ রাতে। আমি ব্যবস্থা করছি”।

ফোন বাজতে শুরু করল অঙ্গীরার ব্যাগের ভেতর থেকে। অঙ্গীরা সোজা হয়ে বসে ধরল, “বলছি। হ্যাঁ। বাড়ি আছি। আসুন”।

ফোন রেখে অঙ্গীরা বলল, “প্রীতি, আপনি আর এক ঘণ্টা থাকুন প্লিজ। আমার একটা জরুরি কল এসেছে। আমি আপনাকে...” ব্যাগ থেকে দু হাজার টাকা বের করে প্রীতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “প্লিজ... প্লিজ”।

প্রীতি বলল, “টাকা লাগবে না। ঠিক আছে আমি আছি। আপনি স্বাভাবিক হন আগে”।

সে অঙ্গীরাকে দাঁড় করাল। সুপর্ণ কাঁদতে কাঁদতে বলল, “মা কোথায় যাচ্ছো?”

অঙ্গীরা বলল, “আসছি বাবা। ওষুধ আনতে যাচ্ছি”।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির হর্নের শব্দ পাওয়া গেল বাইরে থেকে। অঙ্গীরা একটু হাঁটতে গিয়েই প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

প্রীতি তার হাত শক্ত করে ধরে বলল, “চলুন”।

অঙ্গীরা বলল, “না না। আমি যাচ্ছি। আপনি গেটটা বন্ধ করে দিন’।

দেওয়াল ধরে ধরে বেরোল অঙ্গীরা। প্রীতি জানলা থেকে দেখল একটা লোক গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে সিগারেট ধরালো। লোকটাকে সে চেনে। টিভিতে দেখেছে। নামটা এখন কিছুতেই মনে করতে পারলো না...

৭

।।বর্তমান সময়।।

অনেকটা বড় ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট মানেই যে ছোট ছোট ঘরের ধারণা মাথায় আসে, ব্যাপারটা একবারেই সেরকম নয়। ড্রইংরুমটারই বিভিন্ন ভাগে বসার ব্যবস্থা করা আছে। কোথাও চারটে সোফা একসঙ্গে, আরেকটু দূরে পর পর কতগুলো টব সাজানো হয়েছে।

ড্রইংরুমে দুজনে বসে আছেন।

লাহিড়ী ফিসফিস করে বললেন, “এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকতে ভয় লাগবে তো স্যার?”

উপমন্যু বললেন, “তা লাগবে। আমার মনে হচ্ছে এখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে। বলা আছে কাউকে?”

লাহিড়ী বললেন, “আমি বলে রেখেছি। দূর থেকে নজর রাখছে। এ ছাড়া উনি চাইলে কোন লেডি কনস্টেবলকে এখানে ব্যবস্থা করে দিতে পারি”।

ঋতুপর্ণা এলেন। তার দু চোখ ডার্ক সার্কেল। কান্না না নির্ঘুম থাকার জন্য?

ভদ্রতা করেই উপমন্যু উঠে দাঁড়ালেন। লাহিড়ীও উঠে দাঁড়ালেন।

ঋতুপর্ণা বললেন, “প্লিজ অফিসার, আপনারা উঠে দাঁড়াবেন না”।

উপমন্যু বসলেন, “না না। ইটস ওকে। আপনি এখানে একা থাকেন?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “একটা মেয়ে আছে আমার সঙ্গে থাকে। ও বাইরে গেছে। বাজার করতে”।

উপমন্যু বললেন, “আপনার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বলে দিয়েছি”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “দরকার নেই। কী হবে? আমাকে কে মারতে যাবে?”

উপমন্যু বললেন, “অরুণবাবুকেই বা কেন কেউ মারতে যাবে সেটাও তো আমরা কিছু জানি না। এর ফলে খানিকটা প্রি’কশান নেওয়ার দরকার আছে”।

ঋতুপর্ণা দু হাতে মুখ ঢেকে কয়েক সেকেন্ড বসে রইলেন। তার দীর্ঘ চুলগুলো মুখ ঢেকে দিচ্ছে। সামলে উঠে বললেন, “আপনি জানেন এই লোকটা কী সব শুরু করেছিল?”

উপমন্যু বললেন, “কী শুরু করেছিল?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “কী এমন রোজগার ছিল ওর? আজকাল তো গান চলতো না তেমন। এদিক সেদিকে প্রোগ্রাম করে টাকা আসতো”...

উপমন্যু বাধা দিলেন, “গানের চ্যানেল দেখলাম ভাল ভিউ আছে। ওটার তো ভাল টাকা পাওয়া যায়?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “ও পায় না। ওই কোম্পানি কী একটা চুক্তি করে নিয়েছিল, সে টাকার প্রায় সবই ওরা পায়। আমি জানি”।

উপমন্যু বিস্মিত হয়ে লাহিড়ীর দিকে তাকালেন। লাহিড়ী বললেন, “আমি কোম্পানির সঙ্গে খোঁজ নিচ্ছি স্যার। রয়্যালটি প্যাটার্নটা দেখে নিচ্ছি”।

উপমন্যু বললেন, “আর কী বলছিলেন? কী শুরু করেছিলেন অরুণবাবু?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “মেয়েবাজি আর কী! টাকা ওড়াতে শুরু করেছিল। ফলে টাকা শেষ, দেনায় ডুবে গেল”।

উপমন্যু বললেন, “আপনি এত খোঁজ রাখলেন কেন?”

ঋতুপর্ণা শান্ত গলায় বললেন, "অভ্যাস। দায়িত্ব। দূরে থেকে একটা ব্যর্থ মানুষের মত শুধু ওর পতন দেখে গেলাম। কীভাবে মানুষের পতন হয়, সেটা দেখে গেলাম। নিজে ফোন করে বুঝিয়েছি, লোক দিয়ে বুঝিয়েছি, কিছু বুঝতে পারে নি। মিডিয়া দেখলাম আমাকে দোষী বানিয়ে দিয়েছে। আমায় তারা কোন কালেই পছন্দ করে না। এক চ্যানেলের মালিক রাতে মদ খেয়ে আমাকে দুবাই নিয়ে যাবার প্রস্তাব অবধি দিয়েছিল। আমি ছাড়িনি। সে স্ক্রিনশট ঘনিষ্ঠমহলে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলত বুঝতে পারছেন কী হতে পারে? সব দাঁত নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে"।

উপমন্যু বললেন, "স্ক্রিনশটগুলো আমাকে দিতে পারেন?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "পাঠিয়ে দেবো"।

উপমন্যু বললেন, "কবে ঘটেছে এটা?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "দিন সাতেক হল"।

উপমন্যু বললেন, "কার কথা বলছেন?"

ঋতুপর্ণা একটু থমকে গিয়ে বললেন, "অজয় দাস। বিগ ফিস"।

উপমন্যু নোটপ্যাডে নামটা লিখে নিয়ে বললেন, "আর সঙ্গীতা?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "বড় বাজারে মাসে দশ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট নেয় একটা লোক। হেমন্ত খান্না নাম। ওর অর্থকষ্ট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতা ওকে হেমন্তের কাছে নিয়ে গেছিল। দশ লাখ টাকা লোন নিয়েছিল অরুণ"।

উপমন্যু চোখ বড় বড় করে বললেন, "মানে বছরে একশো কুড়ি পারসেন্ট?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "আপনার অবাক হওয়া মানায় না অফিসার। আপনি জানেন এ শহরে এরকম সুদখোর লোক অনেক আছে। আসলের চেয়ে সুদ বেশি। একবার টাকা নেওয়া মানে কয়েক দিনের মধ্যে সর্বস্বান্ত হবার দিকে এগিয়ে যাওয়া"।

উপমন্যু শ্বাস ছাড়লেন, "মানুষের চাহিদার শেষ নেই। কী করবেন? একটা ফোনের দাম দু লাখ টাকা। কেনার এক মাস পর সে ফোন বেচতে গেলে অর্ধেকেরও কম টাকা দাম পাবে। মানুষ তার সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে জিনিস কিনছে। ফলত, হেমন্ত খান্নারা উঠে আসবেই। কিছু করার নেই"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "সঙ্গীতা আমার সঙ্গে ঝামেলা করতো, আমি কিছু বলতাম না। আমাকে জ্বালানোর চেষ্টা করতো। ও যে হিংসেটা করতো, সেটা চোখে দেখা যেতো। কিন্তু ও যেদিন থেকে অরুণকে এই অধঃপতনের দিকে নিয়ে গেলো, সেদিন থেকে বুঝেছিলাম আমি শত চেষ্টা করেও আর অরুণকে বাঁচাতে পারবো না। আমি নিশ্চিত, খোঁজ নিয়ে দেখলে জানা যাবে কোন পাওনাদার মেরে দিয়ে চলে গেছে"।

উপমন্যু বললেন, "আপনি নিশ্চিত এই সুদখোর পাওনাদারগুলো গান চালিয়ে খুন করার টেস্ট দেখাতে পারবে? আপনি ঠিক জানেন এরা এত কালচারাল হবে?"

দরজা ঠেলে একটা মেয়ে বাইরে থেকে ঢুকল। ঋতুপর্ণা বললেন, "তিনটে কফি কর। আর মিষ্টি..."

উপমন্যু হাত তুললেন, "একবারে না। আমরা কফি খেতে পারি। এর বেশি কিছু খাবো না"।

মেয়েটা চলে গেল। উপমন্যু বললেন, "কালচারের কথায় আসি। আপনার কি এটা সত্যি মনে হয়? ওই সুদখোর ফোনে গান বাজিয়ে মারবে"?

ঋতুপর্ণা হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "ঠিক তো। এটা আমার মাথায় আসে নি"।

উপমন্যু বললেন, "আপনার কথা বলুন। এই ফ্ল্যাটে অরুণ এসেছিলেন?"

ঋতুপর্ণা মাথা নিচু করলেন, "না। আসে নি"।

৮

“হ্যালো”।

“হেমন্তজী বলছেন?”

“বলছি”।

“আমি আমার বন্ধু ভানুর থেকে আপনার নাম্বার পেলাম দাদা। আমি খুব বড় একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। আমার সিবিল স্কোর একবারেই নেই দাদা, লোনে লোনে আমি জর্জরিত। কোন ব্যাঙ্ক আমায় টাকা দিতে চাইছে না। আপনি পাঁচ লাখ ফান্ডের ব্যবস্থা করতে পারবেন?”

“ফোনেই সমস্যা মিটে যাবে নাকি? এভাবে হয় না। আমি একটা অ্যাড্রেস দিচ্ছি, চলে আসুন। সামনা সামনি বসে কথা হবে”।

“যাবো দাদা। আপনি প্লিজ বলুন, হেল্পটা হবে তো?”

“হবে। আসুন”।

ফোনটা কেটে গেল।

লাহিড়ী ফোনটা রেখে হোয়াটসঅ্যাপ চেক করে বললেন, “হেমন্ত লোকেশন পাঠিয়েছে”।

উপমন্যু বললেন, “পাঁচ লাখ নিয়ে নাও। একশো কুড়ি পারসেন্ট ইন্টারেস্ট। বাপরে। জাস্ট ইমাজিন, পৃথিবী কোথা থেকে কোথায় চলে গেল, আর এই সুদখোর শাইলকগুলো যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করে নিও টাকা দিতে না পারলে শরীর থেকে ঠিক কতটা মাংস ওকে কেটে দিতে হবে”।

লাহিড়ী বললেন, “ওদিকেই যাবো?”

উপমন্যু বললেন, “চল”।

লাহিড়ী গাড়ি স্টার্ট করলেন।

মিডিয়ার ছেলে মেয়েগুলো ফোন করছে বার বার। উপমন্যু কাউকে নিরাশ করলেন না। সবাইকেই নম্রভাবে জানিয়ে দিলেন কেসে কোন অগ্রগতি হলে সবাই জেনে যাবে।

দুপুর হয়েছে। লাহিড়ীর সঙ্গে উপমন্যু একটা চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। ফোনটা বেজে উঠল তার। ধরলেন তিনি, “বোস স্পিকিং”।

“নমস্কার মিস্টার বোস, আমি অজয় দাস বলছি, আপনার সঙ্গে কি এখন কথা বলা যাবে?”

উপমন্যু ভ্রূ কুঁচকালেন। অজয় দাস, অর্থাৎ ঋতুপর্ণাকে যিনি দুবাই যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই মিডিয়া কর্তা। বললেন, “হ্যাঁ। বলুন”।

অজয় বললেন, “আপনার সঙ্গে একটু বসতে চাই অফিসার”।

উপমন্যু বললেন, “কী ব্যাপারে বলুন তো?”

অজয় বললেন, “অনেক ব্যাপারই আছে। পুলিশ আর মিডিয়া তো একে অপরের থেকে দূরে নেই, তাই না? অনেক কেস তো এখন পুলিশের আগে আমরাই সলভ করে ফেলছি। কিন্তু আমি আপনাকে সম্মান করি। আমি একটা এক্সক্লুসিভ ডিল করতে চাইছি। আপনি যদি সন্ধ্যে একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করেন, আমাদের অফিসে বলছি না। জুপিটার ক্লাব, গলফ গ্রিনে, চেনেন তো?”

উপমন্যু বললেন, “ওকে। লোকেশনটা পাঠিয়ে দিন। আমি সময় পেলে যাবো”।

অজয় বললেন, “ওহ অফিসার, ওটা তো যে সে ক্লাব না, আপনি বুঝতে পারছেন তো, একটা আলাদা স্লট বুক করতে হবে আমাদের মিটিংএর জন্য, আপনি কনফার্ম করলে ভাল হত”।

উপমন্যু বললেন, “তাহলে বরং আপনি একটা যে সে ক্লাবেই মিট করার ব্যবস্থা করুন। আমার পক্ষে ওভাবে কনফার্ম হয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া সম্ভব না”।

অজয় হে হে করলেন, “এরকম বললে লজ্জা লাগে অফিসার, আমি ওভাবে মিন করতে চাই নি কিন্তু। আপনি আবার আমাকে অ্যারোগেন্ট ভাবলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সন্ধ্যায় আপনাকে ফোন করবো। যেখানে কথা বলতে সুবিধা সেখানে কথা বলে নেব কেমন?” উপমন্যু বললেন, “বেটার”।

ফোন রেখে লাহিড়ীকে বললেন, “দুবাই পার্টি। মানে বুঝলে তো?”

লাহিড়ী বললেন, “হ্যাঁ। বুঝেছি স্যার। কী বলছে?”

উপমন্যু বললেন, “দেখা করতে চাইছে। ডিল করতে চায় আর কী!”

লাহিড়ী অবাক হলেন, “আপনি রাজি হয়ে গেলেন?”

উপমন্যু বললেন, “ও দেখা না করতে চাইলে আমি দেখা করতে চাইতাম। ভালোই হয়েছে। রাজি অরাজি নিমরাজি তো পরের গল্প, আগে ওর ভারসানটা শুনি। এখন প্রত্যেকেই সাসপেক্ট। তুমি কি ঋতুপর্ণাকে মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছো নাকি?”

লাহিড়ী অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, “হ্যাঁ মানে কোন অ্যাঙ্গেল থেকেই তো ওর ইনভলভ থাকার কিছু পেলাম না। উল্টে ভদ্রমহিলার নামে ডিভোর্সের পরে কারো সঙ্গে কোন জড়িয়ে যাবার গল্প পাই নি, এই লাইনে থেকেও সেরকম বিতর্ক তো কিছু...”

উপমন্যু বললেন, “হতে পারে বিয়েতে থাকাকালীন অরুণের সঙ্গে বিরাট কোন ঝামেলা ছিল তার প্রতিশোধ নিয়েছেন”।

লাহিড়ী হতাশ গলায় বলল, “তাহলে তো স্যার মিডিয়াও তাই বলছে। ডিফারেন্সটা কী রইল?”

উপমন্যু বললেন, “ছোটবলায় পড়া গোয়েন্দা গল্পের লজিকে ঢুকে গেলে হবে? যেহেতু তুমি যাকে পছন্দ কর না, সে কাউকে দোষী ঠাউরেছে, তার মানে সে দোষী না? এটা কী করে সম্ভব হে?”

লাহিড়ী মাথা চুলকে বলল, “তা ঠিক। সেভাবে কিছু দাঁড়ায় না তা ঠিক। তবে...”

উপমন্যু বললেন, “তবে কিছু না। চল হেমন্তের গান শুনে আসি”।

৯

ঘুপচি একটা ঘর। দুজন দুটো কম্পিউটার খুলে বসে আছে। উপমন্যু আর লাহিড়ী ঢুকলেও দুজনের কেউই তাদের দেখল না। উপমন্যু বললেন, “বসব”?

একজন মনিটরের দিকে মুখ করে গম্ভীর গলায় একবার শুধু “হু” বলল।

উপমন্যু বললেন, “হেমন্তজী, পাঁচ লাখ?”

প্রথম কম্পিউটারে বসা লোকটা বলল, “সিবিল নেই?”

উপমন্যু বুঝলেন ইনিই হেমন্ত। বললেন, “না। অনেকগুলো লোন ডিফল্টার হয়ে আছি। বাড়িতে থাকতে পারছি না সবার জ্বালায়। দেখুন না কিছু করা যায় নাকি”।

হেমন্ত বলল, “বাড়ির কাগজ কার নামে?”

উপমন্যু বললেন, “আমার নামে”।

হেমন্ত বলল, “নিজের বাড়ি তো?”

উপমন্যু বললেন, “অবশ্যই”।

হেমন্ত বলল, “ঠিক আছে। বাড়ির কাগজ, মিউটেশনের কাগজ, ট্যাক্সের কাগজ সব নিয়ে চলে আসুন। ইলেভেন নেবো পার মান্থ”।

উপমন্যু গলা খাকরিয়ে বললেন, “টেন শুনেছিলাম যে?”

অন্যজন বলল, “সব জিনিসের দাম বেড়েছে। এটার দাম তো বাড়বেই। আমাদেরও তো বেঁচে থাকতে হবে নাকি?”

উপমন্যু লাহিড়ীর দিকে তাকালেন। লাহিড়ী বললেন, “বাড়ির কাগজ দেবো, তার গ্যারান্টি কী থাকবে যে সেটা আপনারা নিয়ে নেবেন না”?

হেমন্ত বলল, “পাঁচ লাখ দেবো, সেটা সিবিল ছাড়া, আমরা গ্যারান্টি দেখছি?”

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, “ঠিকই। আপনারা একবার আমাদের সঙ্গে চলুন”।

হেমন্ত এবার উপমন্যুর দিকে তাকালো, “কোথায়?”

লাহিড়ী জামাটা হালকা তুলল। রিভলভার দেখে হেমন্ত ঘাবড়ে গিয়ে তার পার্টনারকে ইশারা করল। পার্টনার ফোন হাতে নিতে যাচ্ছিল, লাহিড়ী বললেন, “ফালতু সময় নষ্ট করিস না। ছোটখাটো বাবা না আমরা। দাদু টাইপের। সময় নষ্ট করলে তোদেরই সমস্যা বাড়বে”।

হেমন্তের পার্টনার মিইয়ে গেল। হেমন্ত বলল, “কী লাগবে বলুন না স্যার। আমরা তো কাউকে জোর করি না। লোকে নিজেরা এসে আমাদের কাছে টাকা চায়। আমাদের ফালতু হ্যারাস করে লাভ নেই”।

উপমন্যু খুশি হলেন, “তা ঠিক। কাজের কথাতে আসি। অরুণ মুখার্জিকে তোরা মেরেছিস?”

হেমন্ত আঁতকে উঠে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “আমরা কেন মারতে যাবো স্যার?”

উপমন্যু বলল, “কত নিয়েছিল?”

হেমন্ত বলল, “আট লাখ”।

উপমন্যু বললেন, “মাত্র পাঁচ লাখের জন্য বাড়ির দলিল চাইছিস। আট লাখ কেন দিবি?”

হেমন্ত বলল, “ওর ক্ষেত্রে আমরা কোন কোল্যাটারাল নিই নি স্যার। সবার কোল্যাটারাল লাগে না। টাকা না পেলে আমরা বুঝে নি তখন”।

উপমন্যু বললেন, “কী করিস? বাড়ি দখল করে নিস”?

হেমন্ত ব্যাজার মুখে বলল, “কেন অপমান করছেন স্যার? তাছাড়া অরুণবাবু আমাদের সব পেমেন্ট করে দিয়েছিলেন। সুদ সমেত। আমরা কেন ওকে মারতে যাবো?”

উপমন্যু ভ্রূ কুঁচকে হেমন্তকে বললেন, “শোধ করে দিয়েছিল?”

হেমন্ত বলল, “হ্যাঁ। যেদিন মার্ডার হলেন, তার আগের দিনই শোধ করে গেছিলেন”।

উপমন্যু বললেন, “শিওর?”

হেমন্ত পার্টনারকে বলল, “জগদীশ, খাতা দে”।

একটা ভারি খাতা এগিয়ে দিল জগদীশ। হেমন্ত খাতা খুলে অরুণের সই দেখিয়ে দিল, “দেখুন, রীতিমত লেখা পড়া করে বাড়ির কাগজ ফিরিয়ে দিই আমরা। আমাদের কাছে সব কিছু সেফ। আজেবাজে ভাববেন না”।

উপমন্যু বললেন, “হু, শুধু আর বি আই অ্যাফিলিয়েশন বাদে সবই আছে”।

হেমন্ত বলল, “ভুল করছেন স্যার। আর বি আই যেভাবে চলে সেভাবে গোটা দুনিয়া চলে না। কত লোককে হেল্প করছি বলুন?”

উপমন্যু বললেন, “একশো বত্রিশ পারসেন্ট সুদ নিয়ে হেল্প? হেল্প না লুঠ বলে”।

হেমন্ত গোঁজ হয়ে বসে রইল।

উপমন্যু বললেন, “খাতা সিজ কর লাহিড়ী”।

হেমন্ত রে রে করে উঠল, “এরকম করবেন না স্যার, কত লোক তাদের সিক্রেট ইনফরমেশন দিয়ে গেছে। এটা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ। আপনি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন স্যার, লোকে তো জেনেবুঝে আসছে। আমরা কাউকে জোর করছি? করছি কি?”

উপমন্যু বললেন, “তাহলে এই অরুণবাবুর পেজটা ফটোকপি করে দে। সেটা পারবি তো?”

হেমন্ত বলল, “এখনই করে দিচ্ছি”।

জাবদা খাতাটা নিয়ে অরুণবাবুর পাতাটা ফটোকপি করে দিল হেমন্ত। সেটা আরও একবার ভাল করে দেখে উপমন্যু উঠলেন, “চল লাহিড়ী। আর হেমন্ত, যখন ফোন করব, আমার কাছে এসে দেখা করবি। নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে”।

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে বলল, “সব সময় স্যার। আমি আর কোথায় যাবো?”

১০

বিকেলবেলা।

ফেরি যাচ্ছে হাওড়ার দিকে। উপমন্যু ঘাটে বসে সিগারেট টানছেন। লাহিড়ী দু চার বার বলার চেষ্টা করেছিলেন, "স্যার দুপুরে খেলেন না কিছু?"

উপমন্যু কানে তোলে নি। খিদে পাচ্ছে না ঠিক।

কলকাতায় গঙ্গার একেক জায়গায় একেক রকম রূপ। উত্তরের দিকটা একবারেই অন্যরকম। সরু গলিগুলো গঙ্গার কাছে আরেকটা সংযোগকারী ছোট রাস্তায় এসে মিশেছে। এক একটা কেসের ছোট গলিগুলো এভাবেই বড় রাস্তাটার সঙ্গে এসে মেশে। মানুষের জীবনকালে তার কতগুলো জায়গা থাকে। প্রত্যেকটা জায়গায় তার কাজ, উপস্থিতি, মেলামেশা... সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ একটা জীবন গড়ে ওঠা। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী, কপালে তিলক পরে যে অরুণ মুখার্জি অনুষ্ঠানে গান করতে যান, গভীর রাতে সেই লোকটার অন্য রূপ। প্রত্যেকটা রূপ জানতে না পারলে সে কেস জটিল হয়ে যায়। তিনি কি পারছেন সবটা জানতে? উপমন্যু সিগারেট পায়ের তলায় ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিয়ে ডাকলেন, "লাহিড়ী"।

লাহিড়ী দৌড়ে এলেন, "হ্যাঁ স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "যে দুজনের সঙ্গে ওই অরুণবাবু কথা টথা বলতেন আর কী... তাদের কোথায় পাওয়া যাবে?"

লাহিড়ী বললেন, "একজন অঙ্গীরা রায়, আরেকজন প্রত্যুষা"।

উপমন্যু বললেন, "ফোন কর প্রথম জনকে। না পেলে দ্বিতীয়জনকে করবে। চল দেখা করে নি"।

লাহিড়ী অভীরাকে ফোন করলেন। অঙ্গীরা রিসিভ করতে লাহিড়ী পরিচয় দিয়ে বললেন, "দেখা করা যাবে?"

অঙ্গীরা ঘাবড়ে গেছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "হ্যাঁ। কোথায় যেতে হবে?"

লাহিড়ী বললেন, "আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি কোথায় আছেন বলুন, আমরা যাচ্ছি। এখন কি যেতে পারবো আমরা?"

অঙ্গীরা বলল, "আমি বাড়িতে আছি। এখন আসতে পারেন"।

লাহিড়ী বললেন, "ওকে, লোকেশন পাঠান। আমরা যাচ্ছি"।

ফোন রেখে লাহিড়ী বললেন, "চলুন স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "কাজে আছেন নাকি খোঁজ নিলে না? যদি সমস্যায় থাকে?"

লাহিড়ী বললেন, "যেতে বললেন তো"।

উপমন্যু উঠলেন, "চল"।

কিছুক্ষণ পরে অঙ্গীরার বাড়ির বাইরে তাদের জিপ দাঁড়াল। সুপর্ণ বারান্দায় খেলছিল। তাদের দেখে বড় বড় চোখ করে বলল, "তোমরা কারা?"

উপমন্যু সুপর্ণর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা তোমার বন্ধু"।

সুপর্ণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, অঙ্গীরা বেরিয়ে এসে বলল, "আসুন"।

বসার ঘরটা একবারেই ছোট। দেওয়ালে আঁকি বুকি। বোঝা যাচ্ছে সুপর্ণর আঁকা।

অঙ্গীরা বলল, "বসুন"।

সোফার মধ্যেও একগাদা খবরের কাগজ। সেগুলো সরিয়ে দুজনে বসলেন।

উপমন্যু বললেন, “আপনি মনে হয় জানতেন আমরা আসবো তাই না?”

অঙ্গীরা মাথা নিচু করল, ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, “উনি ভাল মানুষ ছিলেন। উনি না থাকলে আমি পথে বসতাম”।

উপমন্যু বললেন, “টাকা দিয়েছিল আপনাকে?”

অঙ্গীরা উপর নিচে মাথা নাড়িয়ে বলল, “হ্যাঁ। উনি না থাকলে এ বাড়িতে আসতে পারতাম না। ভাড়ার সিকিউরিটি মানি ছিল এক লাখ টাকা। মাসের ভাড়া বাবদও এগারো মাসের টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়ে গেছিলেন। সঙ্গে ক্যাশ দিয়েছেন”।

উপমন্যু বললেন, “আপনি কী করেন?”

অঙ্গীরা বলল, “যেটা করি, সেটা যে করতে হবে কোন দিন ভাবি নি। আমার আর উপায় ছিল না। বরটা মাতাল, সংসার শেষ করে দিয়েছিল। নামতে হয়েছে”।

উপমন্যু বললেন, “সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল অরুণবাবুর সঙ্গে”?

অঙ্গীরা বলল, “একটা কলে। উনি আমার ফোন নাম্বার নিলেন। আমাকে ওর ভাল লেগেছিল। একটা সময় অন্য কারো কাছে যেতে হত না। সবটা উনিই দেখতেন। ওকে যে মারল, সে তো আমাকেও মেরে গেল স্যার”।

অঙ্গীরা কাঁদতে শুরু করল।

আগে এসব হত না। ইদানীং শুরু হয়েছে। কিছু হলে তার চোখও ভিজে যায়। তার মত পোড় খাওয়া মানুষের এরকম অনুভূতি আসা লজ্জা জনক, সেটা তিনি কোনকালে মনে জায়গা দেন নি। অঙ্গীরার কান্না দেখে উপমন্যুর চোখের কোণও ভিজল। সেটা মোছার দরকার বোধ করলেন না তিনি।

অঙ্গীরা একটু সামলে উঠে বলল, “মানুষ চরিত্র খারাপ বলে খারাপ পাড়ায় গেলে। খারাপ মেয়ের সঙ্গে মিশলে। আমার ছেলেটার বয়স এতটুকু। আমি কোথায় যাবো বলুন তো যদি ভদ্রলোকেরা আমার মত খারাপ মেয়ের কাছে না আসে?”

কলিং বেল বেজে উঠল। অঙ্গীরা দাঁড়াল। বাইরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে চলে এসে বলল, “আমার হাসব্যান্ড। এই ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। এখন রোজ আসবে”।

উপমন্যু বললেন, “দরজা খুলে দিন। আসুক। ওকে আমাদের পরিচয় বলার দরকার নেই”।

অঙ্গীরা দরজা খুলল বাইরে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু হয়ে গেল, অকথ্য ভাষায় গালাগালি, “কী রে, খানকি মাগী, কী ভেবেছিলি, পালিয়ে বাঁচবি? আমি তোকে ডিভোর্স দিয়েছি? লুকিয়েছিস কেন ছেলেকে নিয়ে? টাকা দে, তোর মুখে নেবার টাকা দে, দশ হাজার বের কর মাগী, নইলে এবার আমি...” একটা চড়ের শব্দ পাওয়া গেল। অঙ্গীরা কাঁদতে শুরু করল।

লোকটা ঘরে এসে উপমন্যুদের দেখা মাত্র তাদের দিকে তেড়ে এল, “কাস্টমার? দরদাম চলছে?”

তড়পাতে শুরু করল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড দেখে উপমন্যু একটা থাপ্পড় কষালেন। ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাউ মাউ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল উপমন্যু সজোরে কান মুলে দিয়ে বললেন, “এই বাড়ির ধারেকাছে তোকে দেখলে তোর কী হতে পারে, তুই নিজেও জানিস না”।

“আমি কিন্তু বুঝে নেবো। কে তুই?”

উপমন্যু বললেন, “পুলিশ। চল, লালবাজার চল”।

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য নাটক শুরু হয়ে গেল, কাঁদতে শুরু করে দিল, “স্যার, আমার ছেলেকে দেখতে এসেছি স্যার। ছেলে ছাড়া আমি অন্ধ, বিশ্বাস করুন”।

উপমন্যু লাহিড়ীকে বললেন, “লোকাল থানায় ফোন কর। এটাকে ছাড়া যাবে না। হাজতে ঢোকাক আগে। ইন্টারোগেশন করতে এসে হাতাহাতি করতে হচ্ছে। উফ! মাথাটা এমন গরম করে দিল লোকটা!”

১১

"আপনি এরকম সিনেমা স্টাইলে অ্যানিমেটেড হয়ে গেলেন কেন হঠাৎ করে?"

লাহিড়ীর প্রশ্নটা শুনে উপমন্যু হেসে দিলেন। বললেন, "একটা লোক তার বউকে জোর করে এ লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তারপরেও শান্তি নেই, সে টাকা নিতে আসছে, এসব দেখলে আজকাল নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। বয়স হয়ে গেছে তো"!

লাহিড়ী বললেন, "অঙ্গীরাকে কি তাহলে লিস্টের বাইরে রাখবেন?"

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, "না না। তা কেন? ওভাবে হয় নাকি? সিমপ্যাথেটিক গ্রাউন্ড বলে কিছু হয় না। হতে পারে অঙ্গীরার অন্য কোন ব্যাপার ছিল। কারো পুরো গল্প না জেনে সিদ্ধান্তে আসতে নেই। তবে অঙ্গীরার বরের পুরো গল্প ওর মুখ দেখে বোঝা যায়"।

লাহিড়ী বললেন, "অঙ্গীরার বর জেলাসি থেকে..."

গাড়ি হাজরা ক্রসিঙে সিগনালে দাঁড়ালো। উপমন্যু বললেন, "হু। ব্যাটার ঠিকুজি জোগাড় কর। নাথিং ইজ ইম্পসিবল। তবে এও রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে..." একটু ভেবে বললেন, "এই অঙ্গীরার বাড়িতে অরুণের কোন সিডি দেখলাম না তো!"

লাহিড়ী বললেন, "শোনে না হয়তো। গায়কের গান তার প্রেমিকা নাও শুনতে পারে, পরিচালক হলেই কি তার প্রেমিকা সে সিনেমা দেখবে, লেখকের লেখা তার প্রেমিকা নাও পড়তে পারে..." বলতে বলতে লাহিড়ী হাসতে শুরু করলেন।

উপমন্যুও হাসলেন, "অঙ্গীরার জন্য অনেকটাই করেছেন। প্রত্যুষার জন্য কী করেছেন কে জানে? এই জন্যই লোককে ঠিকঠাক একটা বিবাহিত সম্পর্ক লিড করতে হয়। নইলে সারাজীবন এর তার ঘর ঠিক করে যেতে হবে"।

লাহিড়ী বললেন, "আহ স্যার, লোকটাকে বরং আপনি সোজাসুজি দেখুন। বউকে তাড়িয়েছে সিনেমা করে বলে, আর বাইরের বউদের ঘর করে দিচ্ছে"।

উপমন্যু বললেন, "তাও ঠিক। সেই জন্যই বলছি সব রকম পথ দেখে নিতে হবে। এ লোকটার অনেক শেডস। অজয়ের ক্লাবটা চেনো তো?"

লাহিড়ী বললেন, "হ্যাঁ। চিনি স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "গেছো আগে?"

লাহিড়ী বললেন, "না। তবে দেখেছি। ওদিকে আমার মাসীর বাড়ি"।

উপমন্যু বললেন, "তাহলেই দেখো। এটাই তোমার শেডস। তুমি ওই জুপিটার ক্লাব না কী, সেটা চেনো"।

লাহিড়ী বললেন, "ওটা চিনে আর কী লাভ স্যার? যাই নি তো কোন দিন"।

উপমন্যু বললেন, "যাও নি, আজ যাবে। আর চিন্তা কীসের?"

লাহিড়ী বললেন, "ভাল জামাকাপড়ও পরা হল না"।

উপমন্যু বললেন, "ভাল জামাকাপড় পরে কী হয়? তুমি কোন র‍্যাঙ্কের অফিসার সে খেয়াল আছে? পারসোনালিটি ঠিক রাখো। জামা কাপড়ে কিছু হয় না। এসবের জন্য কখনো সংকুচিত হবে না"।

লাহিড়ী ঘাড় নাড়লেন, "ঠিক আছে স্যার"।

ক্লাবের আলাদা পারকিং আছে। গাড়ি রাখতে অসুবিধা হল না।

উপমন্যু অজয়কে ফোন করলেন। অজয় ফোন ধরে বললেন, "এসে গেছি অফিসার। গেটে আছি। আসুন আসুন"।

উপমন্যু লাহিড়ীকে নিয়ে গেটের দিকে এগোলেন। অজয় উপমন্যুকে দেখা মাত্র ছুটে এলেন, "প্লিজ স্যার। এদিকে"।

উপমন্যু লাহিড়ীকে বললেন, "এসো"।

অজয় লাহিড়ীর দিকে একবার দেখে নিয়ে সামনের দিকে এগোলেন। লাহিড়ী বললেন, "উনি আমাকে এক্সপেক্ট করেন নি মনে হচ্ছে। আমি কি চলে যাবো?"

উপমন্যু বললেন, "না। কেন যাবে? এসো"।

অজয় একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। এসি চালিয়ে দিয়ে বললেন, "বসুন"।

দুজনেই বসলেন। অজয় বললেন, "স্কচ বলি?"

উপমন্যু বললেন, "কিছু লাগবে না। আপনি যে জন্য ডেকেছেন, সেটা বলুন বরং"।

অজয় সোফায় এলিয়ে বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। উপমন্যু সেটাও নিলেন না। লাহিড়ী মাথা নাড়লেন। অজয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেট ধরালেন, "আমাদের চ্যানেল মার্জারে যাচ্ছে। দিল্লির খুব বড় একটা হাউজের সঙ্গে। আমাদের বাজেট বাড়ছে। ফলে বুঝতেই পারছেন, কয়েকটা জায়গা নিয়ে আমরা এখন বেশি ভাবছি। প্রাইম টাইমের টি আর পিই তো সব, তাই না অফিসার?"

উপমন্যু বললেন, "তা তো বটেই"।

অজয় বললেন, "আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম, ভাবতে পারি নি আমাকে এই চ্যানেলের মাথায় বসাবে কেউ। বসিয়েছে। আমি আমার বেস্টটা দি চ্যানেলকে। এর পরেও অনেক লড়াই আছে। অনেকটা জার্নি। আমি আপনাদের ইনভেস্টিগেটিং টিমের সঙ্গে একটা ডিল করতে চাই"।

উপমন্যু হাসলেন, "আমাদের সঙ্গে কোন চ্যানেলের কোন ডিল হওয়া সম্ভব না"।

অজয় বললেন, "আহা, আপনি শুনুন না অফিসার"।

উপমন্যু বললেন, "বলুন"।

অজয় বললেন, "আমরা আমাদের যা ইনপুট আছে এই কেসের ব্যাপারে, তা আপনাদের দেবো। পরিবর্তে আপনারা যা পাচ্ছেন, তা আমাদের দেবেন। আমাদের ইনফো তো আপনারা পাচ্ছেনই, প্রতিটা খবরের পরিবর্তে..."

উপমন্যু বললেন, "তাই ভাবছিলাম। লাস্ট মান্থের রাজিয়া কেসটায় আপনারা কী করে আমাদের ইনফোগুলো পাচ্ছিলেন। সামন্ত ছিল ডিলে?"

অজয় জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "কী যে বলেন অফিসার, আমি সবার সঙ্গে ডিলে যাই না। কারো কারো জন্য আমাদের যেতে হয়ও না। এমনিই চলে আসে। আপনাকে সবাই চেনে। আপনি এক্সট্রিমলি অনেস্ট। আমি টাকার লোভ দেখাচ্ছি না কিন্তু"।

উপমন্যু বললেন, "তবে?"

অজয় বললেন, "সেন্ট্রালে লিংক আছে। আপনাকে সেন্ট্রাল এজেন্সির কনসালটান্ট করে দিতে পারি। বা আপনি বলুন, সেন্ট্রাল থেকে কী চাই"।

উপমন্যু ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করলেন। অজয় বিস্মিত হয়ে বললেন, "কী হল অফিসার?"

উপমন্যু বললেন, "আমার কিছুই লাগবে না। আমরা এসেছি আপনার স্টেটমেন্ট নিতে। এই কেসের ব্যাপারেই। সেটা দিন"।

অজয় বললেন, "মানে? কীসের স্টেটমেন্ট?"

১২

গাড়ি চলছে বাইপাস ধরে। উপমন্যু বললেন, “কী সহজ না পুলিশকে কেনা? একটা দাম দিয়ে দিলেই হল। কাউকে টাকা দেবে, কাউকে ফেবার, পুলিশটা যেন সবার বাপের চাকর হয়ে গেছে”।

লাহিড়ী বললেন, “লোকটা ঘোড়েল। এদের কিছু হবে না, তাই না স্যার?”

উপমন্যু বিরক্তিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “চা খাবো লাহিড়ী। দাঁড়াও কোথাও একটা। মাথাটা কেমন ধরেছে”।

লাহিড়ী বললেন, “থানায় নিয়ে যাবো কোন? সেখানে চায়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে”।

উপমন্যু বললেন, “না না। দোকানে দাঁড়িও। থানায় যাবো না। ভাল লাগছে না”।

লাহিড়ী বললেন, “সঙ্গীতা কাল আসবেন। জানিয়েছেন কেসের ব্যাপারে উনি কিছু জানাতে চান”।

উপমন্যু বললেন, “শুট হয়ে গেছে?”

লাহিড়ী বললেন, “সে সম্পর্কে কিছু জানি না”।

উপমন্যু বললেন, “অরুণ যখন প্রথম রেকর্ড করেন, সে সময় তার সমসাময়িক আরও একজন একই সঙ্গে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অর্ণব সরকার। ভরাট গলা। আমি অর্ণবের গান শুনতাম তখন, আমার দিব্যি মনে আছে। অরুণের গান বরং অনেক বেশি বিখ্যাত হয়ে গেল। রমেশ মুখার্জির সিনেমা “ভাল থেকো বিনি”তে অরুণ “অরূপ তোমার বাণী” গেয়েছিলেন। একটা গানে অরুণ তারকা হয়ে গেলেন। হঠাৎ করে অর্ণব বসে গেলেন। আর রেকর্ড বেরোয় নি। কেউ করতে চায় নি হয়তো। সে সময় তো আর ইউটিউব ছিল না যে কেউ তোমার রেকর্ড করতে চাইলো না তুমি নিজে স্টুডিও ভাড়া করে ইউটিউবে গেয়ে বিখ্যাত হয়ে গেলে। সে সময় অন্য স্ট্রাগল ছিল”।

লাহিড়ী বললেন, “হঠাৎ অর্ণবের কথা মনে পড়ল কেন স্যার? আপনার সাসপেক্ট লিস্টে আছে নাকি?”

উপমন্যু বললেন, “অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মনে পড়ল। সাসপেক্ট লিস্টে থাকার যৌক্তিকতা নেই। অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবছিলাম গানটা চলছিল কেন? লুপে চলছিল। একই গান। সি রেকর্ডস থেকে অর্ণবের গান বেরিয়েছিল। সমীরণ চৌধুরী, দেখি”।

উপমন্যু ফোন বের করলেন। চায়ের দোকান পাওয়া গেল একটা। গাড়ি দাঁড় করালেন উপমন্যু। ফোনে কথা বলে বললেন, “অর্ণব সরকার লোকটা তিন বছর আগে ব্রেইন ক্যান্সারে মারা গেছেন”।

লাহিড়ী বললেন, “তাহলে স্যার আর চিন্তা করে লাভ নেই”।

উপমন্যু শ্বাস ছাড়লেন, “হ্যাঁ। কিন্তু আজ ইউটিউবে ভদ্রলোকের গান সার্চ করে দেখবো। সেখানে তো সবই পাওয়া যায়। অর্ণবের গান না পাওয়ার কিছু নেই। মনে পড়ে গেল। ভাল গাইতেন ভদ্রলোক”।

লাহিড়ী বললেন, “আর কোন কম্পিটিটর ছিল?”

উপমন্যু বললেন, “তপোব্রত বারুই বলে একজন ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। কম্পিটিটর বলা ঠিক হবে না। তপোব্রত তেমন নাম করেন নি। দেখবো? আচ্ছা দেখি”।

উপমন্যু আবার ফোন করলেন। কথা বলে বললেন, “বাঃ, এই এলাকাতেই বাড়ি। একেই কাকতালীয় বলে বুঝলে?”

লাহিড়ী হতভম্ব হয়ে বললেন, “তাহলে স্যার দেখা যাবে এই খুনি। এই জন্য এভাবে মিলে গেছে”।

উপমন্যু হো হো করে হেসে উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ থেকে করুণাময়ীর দিকে যাবার ব্রিজ পেরিয়ে একটা কো অপারেটিভ হাউজিঙ সোসাইটির বিল্ডিঙে হাজির হলেন তারা। খোঁজাখুঁজি করে তপোব্রত বারুইয়ের ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপলেন যখন, তখন রাত দশটা বাজে। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের ভদ্রলোক দরজা খুলে বিস্মিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলুন"।

উপমন্যু বললেন, "আপনিই কি তপোব্রতবাবু?"

"হ্যাঁ"।

"অরুণবাবুর খুনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। কথা বলা যাবে?"

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমি কী করব? আমি খুন করেছি ভাবলেন নাকি?"

উপমন্যু হেসে ফেললেন, "না না। আমি ওই অরুণবাবুর উত্থানের সময়টা কারা গান করতেন তাদের ব্যাপারে একটা লিস্ট করছিলাম। আপনার গান আমি শুনেছি। আপনি এই করেছো ভাল বলে একটা অ্যালবামে গেয়েছিলেন"।

তপোব্রতর দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "আপনি শুনেছেন? মনে আছে? আসুন আসুন"।

উপমন্যু আর লাহিড়ী তপোব্রতর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলেন।

মধ্যবিত্ত মানুষের বসার ঘর। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি।

উপমন্যু বললেন, "আপনার অ্যালবামের কোন ছবি টবি রাখেন নি?"

তপোব্রত অভিমানী গলায় বললেন, "সে তো যেন পূর্ব জন্মের কথা মশাই। কারো কি আর সেসব মনে আছে? আমি তেমন সুবিধে করতে পারলাম না তো! সরকারি চাকরিটা আছে বলে আর সেটাই মন দিয়ে করছি"।

উপমন্যু বললেন, "অর্ণববাবু মারা গেছেন জানেন?"

তপোব্রত বললেন, "শুনেছিলাম। আমার এক কলিগ বলেছিলেন। সবাই অরুণ অরুণ করল, অর্ণবের গান আমার বেশি ভাল লাগত"।

উপমন্যু লাহিড়ীকে বললেন, "দেখেছো? আমি ঠিকই বলেছিলাম তবে"।

লাহিড়ী বললেন, "তা কেন স্যার? গানটা একেকজনের কাছে একেকরকম। আমার যেমন পীযূষকান্তি সরকারের গান ভাল লাগতো না। আমার মার লাগতো। আবার বাবার লাগতো না। সবটাই রিলেটিভ"।

উপমন্যু বললেন, "তা ঠিক। তপোব্রত, আপনি বিয়ে করেন নি?"

তপোব্রত বললেন, "নাহ। আর হয়ে উঠল না। একা আছি, ভাল রান্না করি। আর কী চাই? আমার রান্না আলু পোস্ত খাবেন নাকি? খেয়ে দেখুন"।

উপমন্যু বললেন, "না না। বসুন। আমি অরুণের গানের দিকটা এক্সপ্লোর করতে চাইছিলাম বুঝলেন। ওই স্পটে গান বেজে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল ওই লাইনের লোকজনই এখানে ইনভলভড"।

তপোব্রত বললেন, "আমিও শুনেছি। আমার কাকতালীয় মনে হয়েছে"।

উপমন্যু বললেন, "বাঃ। দ্বিতীয়বার কাকতালীয় ব্যাপারটা এল দেখছি। কেন? কাকতালীয় কেন? হতে পারে এই লাইনের কারো ওর উপর রাগ, তাই কাজটা করিয়েছে বা করেছে"।

তপোব্রত বললেন, "অকারণে কাউকে এভাবে মেরে দেবে মশাই? মানুষ মারাটা কি এত সোজা? ধরুন আমার ওর উপর রাগ আছে, আমার বাজার খেয়েছিল। মানে বাজার যেটুকু হত, ও আসার পরে সেটাও গেল। তা সত্ত্বেও আমি ওকে মারতে যাবো কেন? খুব বেশি হলে ভিড় বাসে একটা চিমটি কেটে দিয়ে পারি"।

উপমন্যু আর লাহিড়ী দুজনেই হেসে উঠলেন।

উপমন্যু বললেন, “এই লাইনের কার ওর উপর এরকম রাগ থাকতে পারে যে ওকে মারার কথা অবধি ভাবতে পারে?”

তপোব্রত একটু ভেবে নিয়ে বললেন, “ওই সময়ে তো এরকম কিছু ছিল বলে মনে হয় না। আর এই সময়ে আমি একবারেই ডিটাচড। স্টুডিও পাড়ায় দেখতে পারেন”।

উপমন্যু বললেন, “থ্যাংকস। ভাল লাগল এসে”। তপোব্রত বললেন, “না না, গেলে হবে না। আমার রান্না আমি খাইয়েই ছাড়বো। দাঁড়ান তো। ভাল লাগছে কথা শুনে। একটা রেকর্ড শুনুন ততক্ষণ, আমার আর অরুণের একটা ডুয়েট আছে। বাজারে পাবেন না। শরত সদনে একটা প্রোগ্রামে এক ভক্ত রেকর্ড করেছিল...”

১৩

।। পূর্বকথা ।।

রাত ন'টা।

অরুণ টিভি দেখছেন। ঋতুপর্ণা এসে তার পাশে বসলেন।

অরুণ বললেন, "খেলাটা জমেছে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমার কিছু কথা ছিল"।

অরুণ লাফিয়ে উঠলেন, "আউট, আউট। উফ... দারুণ সময়ে ক্যাচটা নিয়েছে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "শোন, কথা আছে"।

রিমোট নিয়ে টিভি বন্ধ করে দিলেন ঋতুপর্ণা।

অরুণ অবাক হয়ে ঋতুপর্ণাকে বললেন, "এটা কী করলে? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "কিছু খারাপ হয় নি। সিরিয়াস কথা বলার আছে। হাতে সময় নেই"।

অরুণ বিরক্ত মুখে বললেন, "বল"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "রথীনদা ফোন করেছিল। বড় কাজ পেয়েছি"।

অরুণ বললেন, "ও। সে তো আজকাল তোমার ডানা গজিয়েছে। কাজ পাবে না কেন? পেতেই পারো। তা কতটা খুলতে হবে?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে। দরকারে পুরোটা"।

অরুণের হাত কাঁপতে লাগল। কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালেন। ঋতুপর্ণা শীতল গলায় বললেন, "আমি বলতে এসেছিলাম, যে আমার মনে হয় আমাদের একসঙ্গে থাকার দরকার নেই। ডিভোর্স হলেই ভাল হয়। এমনিতেই তোমার সমস্যা হবে। আমি তো কোন পণ্য নই যে আমাকে দখল করে থাকবে। তুমি উঠতে বললে উঠবো বা বসতে বললে বসবো, ব্যাপারটা সেটা না। দুপক্ষের জন্যই সেপারেশনটা দরকার"।

অরুণ কাশতে শুরু করলেন, কোনমতে বললেন, "যষ্ঠীমধুর শিশিটা দাও"।

ঋতুপর্ণা দিলেন। অরুণ একটু যষ্ঠীমধু নিয়ে মুখে দিলেন, কাশি হচ্ছে তবু। ঋতুপর্ণা পিঠে হাত দিলেন অরুণের, "কী যে কর তুমি, ঠাণ্ডা লাগিয়েছ?"

অরুণ সামলালেন। বললেন, "ছাড়ো। এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি ডিভোর্সের কথা বলছ, সেটা বল"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমি কাজটা করতে চাই। এই সুযোগটা ছাড়তে চাই না। আমি এরকম কিছু করতে চাইলেই তুমি বিশ্রী এবং জঘন্য ভাষায় আমাকে আক্রমণ করছো, এই কথাগুলোর কোনটাই সত্যি না। আমি কারো সঙ্গে কোন রকম কিছুতে নেই। কিন্তু আমি ক্যামেরার সামনে থাকতে পছন্দ করি। আমি এই কাজটা এঞ্জয় করি। আমি জানি এখানে আমি উন্নতি করব। তুমি নিশ্চয়ই মেনে নেবে না?"

অরুণ বললেন, "বাঃ, গড়গড় করে অনেক কিছুই বলে দিলে তো। সারাদিন ধরে এই স্ক্রিপ্টটাই রিহার্স করেছো নাকি? কেউ লিখে দিয়েছে? কে লিখেছে? কোন সুহৃদ? রঞ্জন? ওই মলেস্টারটা? এদিক সেদিক যাক পায় তার সঙ্গে শুয়ে পড়ে আর লোকের বউকে উস্কিয়ে ঘর ভাঙে, সে লিখে দিয়েছে?"

ঋতুপর্ণা হতাশ গলায় বললেন, "দেখেছো? আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে টানছ? রঞ্জন আমার ভাল বন্ধু, কিন্তু এসবে ও কেন থাকবে? ও জানেও না কিছু"।

অরুণ জোরে হেসে উঠলেন, “ভাল বন্ধু! ছেলে আর মেয়ে কখনো বন্ধু হয়? মেয়েরা জানে না, সব ছেলেই ওই বন্ধুত্বের নামে শুতে চায়। সেক্স করতে চায়। কেন তুমি বোঝো না? ন্যাকা নাকি তুমি?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “অকারণ এবং অহেতুক তর্কটা করে যাচ্ছো। আমি তোমাকে সেই সলিউশনটাই বলেছি যেটা আমাদের জন্য বেস্ট। তুমি তো গান কর, তোমার সঙ্গে মহিলা শিল্পীরা ডুয়েট করেন, আমি কোনদিন বলেছি তুমি তাদের সঙ্গে শোও? কারণ আমি জানি শিল্পের সঙ্গে এসবের কোন যোগ নেই। আমার ব্যাপারে কিছু বলার সময় কিন্তু তুমি সেসব মাথায় রাখো না। যা পারো বলে যাও। আমার সেগুলো শোনার প্রয়োজন নেই”।

অরুণ বললেন, “আমি ডিভোর্স না দিলে তো ডিভোর্স হবে না”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “কেস হবে। কেস চলবে। কাদা ছোঁড়াছুড়ি হবে। কাগজে লেখালেখি হবে। দিনের পর দিন একটা ঝামেলা টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেগুলো দরকারি? আমরা কেউ কারো কাজ করতে পারবো না ঠিক করে”।

অরুণ বললেন, “সব ভেবেই এসেছো তুমি। তাই তো?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “হ্যাঁ। ভেবে এসেছি”।

অরুণ বললেন, “আমার থেকে এসব নৌটংকি বড় হয়ে গেল?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “হ্যাঁ। হয়ে গেল। কী করব? নিজের জায়গাটা নিজে ঠিক রেখেছ কি? সারাক্ষণ আমার সঙ্গে কাউকে না কাউকে কাল্পনিকভাবে জড়িয়ে বাজে কথা বলে যাচ্ছো, আমিও তো একটা মানুষ।”

অরুণ হাত নেড়ে বললেন, “বাজে ফালতু এক্সকিউজ। যাই হোক, চাচ্ছো না যখন, ফালতু বকে তো লাভ নেই। ডিভোর্স দিয়ে দেবো। এখন বেরোবে? চল তোমাকে দিয়ে আসি”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “এখন? এত রাতে কে যাবে?”

অরুণ বললেন, “রাত কোথায়? কোন রাত না। ইচ্ছে যখন করেছো, তারপরে তো তোমার আর এই বাড়িতে থাকা ঠিক না। চল। ওঠো”।

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে ঋতুপর্ণার হাত ধরে টানলেন।

ঋতুপর্ণা মুখ বিকৃত করলেন, “আমার লাগছে। প্লিজ আমাকে ছাড়ো। আমাকে চেঞ্জ করতে দেবে না?”

অরুণ সজোরে ঋতুপর্ণার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে বাড়ির দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ঋতুপর্ণা চুপ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন...

১৪

।।বর্তমান সময়।।

পিয়ালী দরজা খুলে বললেন, "তুমি তো দেখছি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দিলে গো! এত দেরী তো আগেও করতে না"।

উপমন্যু হেসে উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকেই সরাসরি বাথরুমে ঢুকে গেলেন। ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "খেতে দাও শিগগিরি। মারাত্মক খিদে পেয়েছে"।

পিয়ালী বললেন, "বস"।

উপমন্যু বসে বললেন, "তাতান ঘুমিয়ে পড়েছে?"

পিয়ালী রুটি দিতে দিতে বললেন, "হ্যাঁ। ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে টিভিতে আপডেট দেখছে তোমার কেসের। আচ্ছা, এই ঋতুপর্ণার নাকি সিক্রেট বয়ফ্রেন্ড আছে?"

উপমন্যু বললেন, "তাই? জানি না তো"!

পিয়ালী হতাশ গলায় বললেন, "সে কী গো, তোমার রেপুটেশন নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে তো! চ্যানেল জানতে পারলো, তুমি জানতে পারলে না?"

উপমন্যু বললেন, "কী বলছে চ্যানেল?"

পিয়ালী বললেন, "একটা কালো মুখ দেখিয়ে বলছে কে ঋতুপর্ণা দেবীর সিক্রেট বয়ফ্রেন্ড? কার সঙ্গে কথা বলেন ঋতুপর্ণা? এই কেসের সঙ্গে তার যোগাযোগ কী? অরুণের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে করেন নি অভিনেত্রী? তবে কি ছিল আরও বড় কোন প্ল্যান?"

উপমন্যু রুটি খেতে খেতে বললেন, "ভাল গল্প বানিয়েছে কিন্তু। সব চ্যানেলেই দেখাচ্ছে?"

পিয়ালী বললেন, "না, একটায় দেখাচ্ছে। নামটা ভুলে গেলাম আবার। আমার এই হয়েছে, নামগুলো মনে থাকে না। ব্রাহ্মীশাক খেতে হবে"।

উপমন্যু বললেন, "এনে দেবো। খেও। তোমার চ্যানেলগুলো এখনও খুনি বের করতে পারলো না?"

পিয়ালী বললেন, "না। তবে, ঋতুপর্ণার মাথা খেয়ে নিচ্ছে। বেচারির অবস্থা খারাপ। যেখানে যাবে ক্যামেরা নিয়ে পেছনে পেছনে যাচ্ছে। এটাই চাকরি বল?"

উপমন্যু বললেন, "হু। এটাই চাকরি। পেটের জন্য সব করতে হয়। এখন সময়টাই তো নিজেকে বেচে দেবার। যে যত ভালভাবে নিজেকে বেচতে পারবে, সে তত রোজগার করতে পারবে। টাকাটাই মুখ্য। কেউ প্রাইভেসী বিক্রি করছে, কেউ ব্যক্তিত্ব। কিছু করার নেই। বেচতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়"।

পিয়ালী ম্লান মুখে বললেন, "আমাদের মেয়েটার কী হবে বল তো? ও তো কারো সঙ্গে ঠিক করে কথাও বলতে পারে না। কী করবে কে জানে"।

উপমন্যু বললেন, "চিন্তা করার কিছু নেই। এই ভিড়ের বাইরেও আরেকটা আলাদা জায়গা আছে। সে জায়গাটা হল নিজের জায়গা। নিজের দামটা নিজে দিতে পারলে অসুবিধে হবে না। ভেবো না"।

পিয়ালী বললেন, "দেখো, তাই হলেই ভাল। ভাবতে না চাইলেও ভাবতে হয়। তুমি তো আর ভাবার সময় পাচ্ছো না। আমাকে ভাবতে হচ্ছে। মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে হবে"।

উপমন্যু রেগে গেলেন, "এখনই বিয়ে কেন? পড়াশুনা করছে তো! পি এইচ ডি করলে সেটাও করুক। জোর করে কিছু করার দরকার নেই"।

পিয়ালী বললেন, "তাও ভাবতে হবে। সব কিছুই দেখতে হয়। তুমি গোয়েন্দাগিরি করে যাবে, এদিকটা তো অন্তত আমাকে দেখতে হবে"।

উপমন্যু বললেন, "ওসব জানি না। এখন পড়ুক। বিয়ে টিয়ের জন্য সারাজীবন পড়ে আছে"।

ফোন বেজে উঠল উপমন্যুর। লাহিড়ী ফোন করছেন, উপমন্যুর খাওয়া হয়ে গেছিল, ফোন কেটে দিলেন। হাত ধুয়ে কল ব্যাক করলেন, লাহিড়ী ধরে বললেন, "স্যার, বিজি আছেন?"

উপমন্যু বললেন, "না। খেয়ে হাত ধুলাম। বল"।

লাহিড়ী বললেন, "অর্ণব সরকারের গান শুনলাম স্যার। সত্যিই ভাল। আপনাকে লিঙ্ক পাঠিয়েছি"।

উপমন্যু খুশি হলেন, "বাঃ, এটা একটা কাজের কাজ করেছো। পৃথিবী ডিজিটাল হওয়ায় এটা একটা সুবিধা হয়েছে যাই বল, অনেক কাজের জিনিস পাওয়া যায়"।

লাহিড়ী বললেন, "কিন্তু লোকটা উঠতে পারলেন না, এটা কষ্টকর"।

উপমন্যু বললেন, "শুধু ভাল গাইতে পারলেই হয় না। ধরে নাও এটা আর্টের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যাকিং, প্রচার, কপাল... অনেক কিছু ম্যাটার করে। অর্ণবের কপাল খারাপ ছিল, ব্যাকিংও ছিল না তেমন, ফলে যা হবার তাই হল"।

লাহিড়ী বললেন, "লং রানে তো অরুণও শেষ অবধি পারলেন না"।

উপমন্যু বললেন, "সেটারও আলাদা কারণ আছে। ধরে নাও, এই ইউ টিউব ইত্যাদি আসার পরে আগের ব্যাকিংগুলিও আর লাগছে না। প্রচুর শিল্পীর ভিড়ে তখন আরেকটা ফ্যাক্টর উঠে আসে। গানের বাইরেও এখন অনেক বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে সেসব। যাক গে, কাল সঙ্গীতা কখন নামছেন?"

লাহিড়ী বললেন, "সকালের ফ্লাইট বলেছেন। আমরা কি এয়ারপোর্টে চলে যাবো?"

উপমন্যু বললেন, "না। নামার টাইমটা খেয়াল রেখে ফোন কোর। ফ্রেশ হয়ে নিয়ে কখন সময় দিতে পারবেন দেখো। আর একটা কাজ কর..." একটু ভেবে উপমন্যু বললেন, "না থাক"।

লাহিড়ী বললেন, "কী কাজ?"

উপমন্যু বললেন, "আমি চ্যাটটা পাঠাতে বলব নাকি ভাবছিলাম, মানে অরুণ অঙ্গীরার। দরকার নেই। এখন দেখব না। ছাড়ো"।

লাহিড়ী বললেন, "ওকে স্যার"।

উপমন্যু ফোন রেখে ঘরে গিয়ে বসলেন। নোটপ্যাড বের করলেন। এবার গোটা দিনের সারসংক্ষেপ লিখে নেওয়ার পালা...

১৫

।।পূর্বকথা।।

।। ঋতুপর্ণা অরুণের ডিভোর্সের আগের ঘটনা।।

প্রিয় সঙ্গীতা,

অনেকদিন তোমার সঙ্গে সামনা সামনি বসে কথা বলা হয় না। শেষ কবে বলেছিলাম? ফুলশয্যার দিনে, তাই না?

তোমাকে বলা হয় নি, বলতে পারি নি। আমি কপর্দকশূন্য হয়ে গেছি। ভিখিরি বললেও কম বলা হয়। তুমি যে টাকাগুলো বিশ্বাস করে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে, সে সব টাকা আমি জুয়া খেলে হারিয়ে ফেলেছি। তুমি জানো সে টাকা বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে অনেক হয়ে গেছে। প্ল্যান করে রেখেছ, একটা নতুন বাড়ি। তোমার ফ্ল্যাট ভাল লাগে না। বস্তির থেকেও অধম, প্রতিবার বলেছ। আমি ভেবেছি ঠিকই তো। তোমার কথার দাম আছে।

আমি তোমার টাকাগুলো নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাবার আগে স্যামুয়েলের আড্ডায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম একদিন। দশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার হয়ে গেল একটা টেবিলেই। আমি তোমাকে বলি নি। ওরাও বলল আমি পারবো। আমি দারুণ পারবো।

একবারেই বুঝিনি, ওটাকেই বিগিনারস লাক বলে। সেই শুরু হল আমার টাকা হারানো। যখনই কোন পেমেন্ট এনে দিয়েছো, আমি আর ব্যাঙ্কে দিই নি। কোন দিন জিতেছি, কোন দিন সব টাকা হারিয়েছি। একটা অদ্ভুত নেশার ভেতরে চলে গেছিলাম আমি। তোমাকে মিথ্যা বলার নেশা, টাকাগুলোকে জুয়ায় লাগানোর নেশা।

এক এক করে আমি তোমার সব টাকা তো হারালামই, কিন্তু আমার নেশা কমল না। আমি তখন তোমার এফ ডি ভেঙে দিলাম। তারপর সে টাকা দিয়ে আবার খেলে সব হারালাম। সব সঙ্গীতা। কুড়ি লাখ টাকার আর এক টাকাও অবশিষ্ট নেই। এরপরে কী করলাম বল তো? এ বাড়ির দলিল বন্ধক রেখে টাকা নিলাম। তিরিশ লাখ। ভাবলাম এই টাকা দিয়ে আগের কুড়ি লাখ উঠে আসবে। আমি আসলে কিন্তু ঠিকই জানতাম আসবে না, কিন্তু কী বলব? আমার তো মাথাতে তখন ঢুকে গেছে এই প্রবল নেশা। আমি পাগলের মত আবার খেলতে শুরু করলাম। দিন পাঁচেকের মাথায় আমি সেটাও হারালাম। বাড়ি গেল, ব্যাঙ্কের টাকা গেল, এফ ডি, সেভিংস সব শেষ। নিজেকে মুজতবা আলীর সমীরুদ্দীর ভাই বলে মনে হচ্ছে আমার। কী বিশ্বাস করে টাকাগুলো দিয়ে দিতে আমাকে তুমি! কত ভালবাসা, কত কিছু। এই সংসারে আমি কিচ্ছু দিতে পারি নি। শেষ করেছি শুধু। তবে হ্যাঁ, একটা কাজের কাজ করেছিলাম বছর পাঁচেক আগে যখন চাকরি করতাম। আমি টার্ম ইন্সিউরেন্স করেছিলাম আমার নামে। আমি বেঁচে থাকতে তো তুমি সে টাকা পাবে না, বাড়ি বাঁচবে না, তোমার টাকাও আসবে না। আমি মরলে তোমার সব উসুল হয়ে যাবে। ওরা সুইসাইড কভার করে, ছেলেটা আমাকে বলেছিল, আমি ডকুমেন্টেও দেখে সেটা জেরক্স করে মার্ক করে রেখেছি। খাটের উপরেই থাকলো। কোম্পানি জ্বালাতন করলে ওদের চ্যালেঞ্জ কোর এই পলিসি ডকুমেন্ট দেখিয়ে।

একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। কখন যে এই নেশা আমার মাথা দখল করে নিয়েছিল, আমি জানি না। কিন্তু যখন আমি চোখ খুললাম, নেশা নেমে গেল, আমি বুঝলাম আমি এই পৃথিবীতে বাঁচার সমস্ত অধিকার ক্ষুইয়েছি। আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই আমার।

বেঁচে থাকবোই বা কী করে বল তো? কী মুখ দেখাবো তোমাদের কাছে?

আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জানি। তবু হাত জোড় কর শেষবারের মত ক্ষমা চেয়ে গেলাম। অপরেশ...”

ঘুম পাচ্ছে সঙ্গীতার। চুপ করে বসে আছেন তিনি।

ঋতুপর্ণা এসে তার কাঁধে চাপ দিলেন, “ওঠ। কিছু খা”।

সঙ্গীতা মাথা নিচু করলেন।

অরুণও এসেছেন। সোফায় বসেছেন আসার পরে। ঋতুপর্ণা বললেন, “বডি নিয়ে গেছে বলল, পোস্টমর্টেম তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ভাবিস না”।

সঙ্গীতা একটুও কাঁদেন নি। মাথা তুলে অরুণকে দেখে বললেন, “দাদা এসেছেন? চা বলি”।

অরুণ বললেন, “না না ব্যস্ত হবেন না। আমি চা পরে খাবো”।

ঋতুপর্ণা সঙ্গীতার হাত জড়িয়ে ধরলেন, “ভেঙে পড়িস না, সব ঠিক হয়ে যাবে”।

সঙ্গীতা এবার আর পারলেন না, ঋতুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। মিডিয়া ঢুকে গেছিল কোনভাবে, ছবি তুলতে শুরু করল।

অরুণ রেগে গেলেন, “একী, আপনারা কি মানুষ? ফটো তুলছেন? মানুষের শোকের ফটো তুলছেন? এগুলিও বিক্রি করবেন? বেরোন, বেরোন”।

অরুণ মারমুখী হয়ে উঠলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

ঋতুপর্ণা বেশ কিছুক্ষণ সঙ্গীতাকে সামলে বললেন, “তুই বস, আমি চা বানিয়ে আনি”।

সংগীতা বললেন, “না না। তুই কেন...”

ঋতুপর্ণা বললেন, “চুপ কর। বস চুপ করে”।

উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

অরুণ সঙ্গীতার সামনে বসে বললেন, “ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে”।

সঙ্গীতার অবিন্যস্ত শাড়ি। যেন এক বিষণ্ণ নিটোল যৌবন খেলা করে যাচ্ছে শরীর জুড়ে। অরুণ হঠাৎ প্রবল উত্তেজনা বোধ করলেন তার শরীরে...

১৬

।।বর্তমান সময়।।

"আমি একটা ভাল সোয়েটার কিনবো বাবা। অর্চি বলল নৈনিতাল নাকি পুরো ইউরোপের শহরের মত সুন্দর"।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসেই টেবিলে কথাগুলো বলল তাতান। পিয়ালী চোখ বড় বড় করলেন, "অর্চিটা কে রে? এই নামটা শুনি নি তো! বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছিস নাকি?"

উপমন্যু বিরক্ত হলেন, "আহ, ছেলে বন্ধুও হয়। আজেবাজে বোল না তো"!

তাতান বলল, "অর্চির কথা বলেছি। ভুলে গেছো। আমাদের সঙ্গেই পড়ে। মা খালি এসব ভাবে। আসলে বাবা জানো তো, মারই গোয়েন্দা হওয়া উচিত ছিল"।

উপমন্যু ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা আর বলতে? যেভাবে বুঝে যায় কোনদিন শুধু টিফিন খেয়েছি আর কোনদিন টিফিনের সঙ্গে ক্যান্টিনের অমলেট কিনে খেয়েছি, গোয়েন্দা ছাড়া সেটা আর কে বুঝবে?"

পিয়ালী বললেন, "না বোঝার তো কিছু নেই। আমি তোমায় যেদিন পাউরুটি দিই, টিফিন ফেরত আনার সময় তাতে কাচালংকা থাকলেই বুঝতে হবে তুমি অমলেট কিনে খেয়েছ। তাও তো ধরা পড়তে না, যদি টিফিন ক্যারিয়রটা ধুয়ে আনতে। তুমি যেরকম থাকে, সেরকম নিয়ে চলে আসো। ধরা তো পড়বেই। খুন করার পর ফিঙ্গারপ্রিন্ট রাখলে ধরা তো পড়বেই"।

উপমন্যু খুশি হলেন, "ভাল বলেছ তো। আমাকেও একবার চেক করে নিতে হবে ফিঙ্গারপ্রিন্টের রিপোর্টটা। নাহ, খামোখা আমি একা একা ঘুরে বেড়াই। তোর মাকে আমার পার্টনার করে নিলে খারাপ হবে না"।

পিয়ালী বললেন, "হ্যাঁ, সংসারটা উচ্ছন্নে যাক তাহলে। আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। আর এই যে তাতান, তুই যে আশা করে আছিস তোর বাবা তোকে নৈনিতাল নিয়ে যাবে, তার জন্য আবার সোয়েটার কেনারও প্ল্যান করে ফেলেছিস, তা তুই জানিস তো কেসটা না মিটলে তোর বাবা কোথায় যাবে না?"

তাতান দুঃখী গলায় বলল, "ছাড়ো না। এমনিতেই টেনশনে আছি যাওয়াটা নিয়ে। তুমি আরও বেশি বেশি করে কথা বলে সেটাকে জিঙ্কস করছো। কোর না। সোয়েটার তো কেনাই যায়"।

পিয়ালী বললেন, "হ্যাঁ কোলকাতার গরমে তুই সোয়েটার কিনবি। ওটাই বাকি আছে"।

বাইরে থেকে গাড়ির হর্নের শব্দ পাওয়া গেল। উপমন্যু উঠে পড়লেন, "লাহিড়ী এসে গেছে। বেরোই"।

পিয়ালী বললেন, "টিফিন খেও দয়া করে। করে দিয়েছি। রিটায়ারমেন্টের পরেও টিফিন বানাতে হচ্ছে। আমার কপাল"!

উপমন্যু হাসতে হাসতে টিফিনের ব্যাগ নিয়ে বেরলেন। জিপে উঠে বললেন, "ফোন করে নিয়েছ তো? সঙ্গীতা বাড়ি ঢুকেছেন?"

লাহিড়ী বললেন, "হ্যাঁ স্যার উনি বাড়ি ঢুকলেন জাস্ট"।

উপমন্যু বললেন, "বেশ। চল"।

লাহিড়ী গাড়ি স্টার্ট করলেন। উপমন্যু বললেন, "তাহলে? অর্ণবের গান ভাল লাগল?"

লাহিড়ী উত্তেজিত হয়ে গেলেন, "ভাল? কী যে বলেন স্যার? ভাল তো খুব ছোট শব্দ ওকে ডেস্ক্রাইব করার জন্য। এত সুন্দর গানের গলা। নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক আমাকে। ওকে কি ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরানোর জন্য কোন স্পেশাল এফোর্ট দেওয়া হয়েছিল? পলিটিক্স করে তাড়ানো হয়েছিল?"

উপমন্যু বললেন, "পুরনো দিনের রিপোর্টাররা বলতে পারবে। অমলদা এখন বেঁচে নেই। বিশ্বজ্যোতিদা বলতে পারবে। আশা করবো, ওই সময়ের অনেক কথা জানেন। তবে অরুণের প্রাইম টাইমে উনি অর্ণবকে উঠতে বাধা দিয়েছেন, আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। তবে কজন মানুষকে আর চিনলাম?"

লাহিড়ী বললেন, "মনিকা সেলেস বলে একজন টেনিস প্লেয়ার ছিলেন, অনেকে বলে স্টেফি গ্রাফ তাকে ছুরি মারিয়েছিলেন। যদিও ভিত্তিহীন ব্যাপারটা। তবে রাইভ্যালরি থেকে অরুণবাবু কী করেছিলেন, কতটা এফোর্ট দিয়েছিলেন অর্ণবের কেরিয়র শেষ করতে, সেটা জানা দরকার। বিশ্বজ্যোতি বাবুর ফোন নাম্বার আপনি আমাকে দিতে পারেন। আমি কথা বলে জেনে নেবো না হয়"।

উপমন্যু বললেন, "ঠিক আছে। আমি হোয়াটস অ্যাপে ওর ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তুমি কথা বলে নিও"।

লাহিড়ী মাথা নাড়লেন, "ওকে স্যার। অরুণের উপর তপোব্রতবাবুর রাগ আছে বলে মনে হল না"।

উপমন্যু বললেন, "সময়। আসলে সময়ই সব ক্ষতে মলম দেয়। স্মৃতি ক্ষতে নুন ছেটায়, আর কিছু না"।

সঙ্গীতার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছিলেন তারা। লাহিড়ী সঙ্গীতাকে ফোন করে বাড়ির সঠিক দিক নির্দেশ নিয়ে নিলেন।

১৭

"আমি খুব টায়ার্ড অফিসার, খুব টায়ার্ড। মানসিকভাবে বিধ্বস্তও বটে"।

ঘরে ঢুকেই বললেন সঙ্গীতা।

উপমন্যু বললেন, "কয়েকটা রুটিন প্রশ্ন করব ম্যাডাম। তেমন কিছু সময় নেবো না"।

সঙ্গীতা সোফায় বসে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "আমাকে ইন্টারোগেট করার ব্যাপারে ফোনও গেছিল। আমাকে একটা কথা বলবেন? আমার নাম কে তুলেছে? ঋতু?"

উপমন্যু বললেন, "সেটা আমরা বলতে পারবো না। কিছু গোপনীয়তা আমাদের মেইন্টেইন করতে হয়, আশা করি আমার বাধ্যবাধকতা আপনি বুঝবেন"।

সঙ্গীতা বললেন, "হ্যাঁ, বুঝবো। না বোঝার কিছু নেই। দেখুন অফিসার, আমার হাজব্যান্ড ছিল খুব বড় একজন জুয়াড়ি। প্রফেশনাল জুয়াড়ি বলতে যা বোঝায়, একবারে তাই। আমি অনেকদিন ধরে যা রোজগার করেছিলাম, আমার বর সব ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আমাকে নিজেকে নিংড়ে যেতে হয় রোজ। বেঁচে থাকতে হবে তো বলুন? ক দিন আর পারবো? তারপর বসে কে খাওয়াবে আমাকে? বাগডোগড়া থেকে ছুটতে ছুটতে এলাম। এত টেনশন হচ্ছিল আপনাদের ফোন পাবার পর থেকে। আর অরুণের ব্যাপারটা শোনার পর থেকে আমি আর ঠিক নেই। এত ভাল একজন মানুষ, কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, আমিই জানি।"

উপমন্যু বললেন, "ওর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বটা কি ওদের ডিভোর্সের আগে থেকেই ছিল?"

সঙ্গীতা বললেন, "হঠাৎ করেই। আমার হাজব্যান্ড যেদিন মারা গেল, ওরা দুজনে এ বাড়িতে এসেছিল। আমাকে সান্ত্বনা দিতে। সেদিন রাতে আমায় ফোন করে। ঋতুকে না জানিয়েই। আমাকে বলেছিল ওকে না বলতে। আমি বলি নি। তারপর ওদের ডিভোর্স হল। আমাদের সম্পর্কটা গভীর হল। অরুণ আমাকে বিয়ে অবধি করতে চেয়েছিল। স্ক্যান্ডালের ভয় টয় ও পায় না, আমিও পাই না। কে কী বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটা সম্পর্কে থেকে আমি এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম এই বিয়ে নামক ব্যাপারটার প্রতি, তারপর থেকে আমি আর মন থেকে সায় পাই নি"।

উপমন্যু বললেন, "তা ছাড়া অরুণবাবুর ভয়াবহ লোনও হয়ে গেছিল বাজারে, তাই না?"

সঙ্গীতা যেন একটু চমকালেন, চোখের পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "বলেছিল আমাকে। আমার হাজব্যান্ড একজনের কাছে টাকা নিতো। আমি তার নাম্বার দিয়েছিলাম"।

উপমন্যু বললেন, "আপনার হাজব্যান্ড যার থেকে ধার নিতেন, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল কী করে?"

সঙ্গীতা বললেন, "ও চলে যাবার পর টাকা উসুল করতে লোক পাঠিয়েছিল। আমার বর দু লাখ টাকা নিয়েছিল। সুদে আসলে সে টাকা পাঁচ লাখ টাকা হয়ে গেছিল। আমি প্রথমেই বেঁকে বসেছিলাম। এত সুদ আমি দেবো না। একটা সেটেলমেন্ট হল। তিন লাখ টাকা দিতে হল। দু লাখ টাকা বাঁচল। কত টাকা ইন্টারেস্ট গেল, তাও ভাবলে এখনও আমার শরীর খারাপ হয়"।

উপমন্যু নোটপ্যাডে লিখলেন, "হেমন্ত... হেমন্তকে ধরতে হবে কেন দু লাখ কম নিল"।

নোটপ্যাডটা রেখে উপমন্যু বললেন, "ইদানীং আপনার সঙ্গে অরুণবাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল? আপনি জানতেন ওর দুজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কোন একজনকে আবার বাড়ি ভাড়া করিয়ে দিয়েছিলেন"।

মাথা নাড়লেন সঙ্গীতা, “না। এত গভীরে আমি কিছু জানতাম না। ওর শারীরিক চাহিদা ছিল। সেটা বেশিই ছিল। ঋতু সেটা মেটাতো না। ঋতুর মাথায় তখন হিরোইন হবার চিন্তা ঢুকে গেছিল। এক ঘরে শুতো না পর্যন্ত দুজনে। আমি তো জানি বিয়ের পর থেকে ওদের ফিজিক্যাল রিলেশন বলেই কিছু ছিল না। অরুণ বেচারি ছটফট করতো। ঋতু চলে যাবার পর দিশেহারা হয়ে গেছিল লোকটা”।

উপমন্যু বললেন, “ওই দুজনের অস্তিত্ব থাকলে আপনার অসুবিধে হবার কথা না তাহলে বলছেন?”

সঙ্গীতা বললেন, “কোন দুজন? ওহ ওই মেয়েদুটো? আমার সুবিধে অসুবিধের তো কিছু নেই অফিসার। আমি তো অরুণের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কে ছিলাম না। বলতে পারেন আমরা ফ্রেন্ডশিপের ওপেন রিলেশনশিপে ছিলাম। আমাদের মধ্যে অতো উত্তর দেওয়ার দরকার পড়ে নি এখন পর্যন্ত”।

লাহিড়ী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, “আপনাকে অ্যাবরশন করাতে হয়েছিল ক মাস আগে...”

সঙ্গীতা রাগী চোখে লাহিড়ীকে বললেন, “সেটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। তা নিয়ে আমি কিছু বলতে যাবো না”।

উপমন্যু বললেন, “আপনার তাহলে তেমন কোন মোটিভ দেখা যাচ্ছে না। আপনার বন্ধু অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ঘুরলে আপনার আপত্তি ছিল না...”

সঙ্গীতা বললেন, “আমি মনে হয় বোঝাতে পারছি না। আমাদের কে কোন রিলেশনে যাবে, তা নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না। বুঝতে পারছেন?”

উপমন্যু হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালেন, “বুঝেছি। ঠিক আছে ম্যাডাম, কিছু মনে পড়লে আমাকে ফোন করতে পারেন। আমার নাম্বারটা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি”।

সঙ্গীতা বললেন, “আমার তো মনে হয় অরুণের উপর সব থেকে বেশি রাগ কারো থাকলে সেটা ঋতুর থাকবে। সেটা থেকে নজর ঘোরাতে ঋতু চেষ্টা করে যাবে। ওর অনেক মিডিয়ার উপরের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়”।

উপমন্যু বললেন, “যেমন? কী নাম তাদের?”

সঙ্গীতা বললেন, “আছে। বিভিন্ন লোক আছে। ওকে দেখে যতটা সরল বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু তা না”।

উপমন্যু ঘাড় নাড়লেন, “ঠিক আছে। মাথায় থাকবে। আসি ম্যাডাম”।

১৮

"দুজন পরস্পরকে দোষ দিয়ে যাচ্ছে স্যার। দুজনের একে অপরের উপর প্রচুর রাগ"।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন লাহিড়ী।

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ, সেই চিরাচরিত ব্যাপার আর কী। এক ফুল দো মালি না কী বল তোমরা, সেই ব্যাপার"।

লাহিড়ী বললেন, "আমরা দু পক্ষের কথাই সমান গুরুত্ব দেবো, তাই তো স্যার?"

উপমন্যু বললেন, "অবশ্যই। দুজনের যে কেউ খুনী হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। ওই প্রত্যুষার খবর কী?"

লাহিড়ী বললেন, "হাউজওয়াইফ স্যার। হাজব্যান্ড বহুদিন আগে নিখোঁজ। লাইনে নামা তারপরে। ওর স্টেটমেন্ট নেবেন?"

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ সেটা তো নেবো। কিন্তু তার আগে একবার অরুণের রয়্যালটি সম্পর্কিত ব্যাপারটা দেখে আসি চল"।

লাহিড়ী চায়ের দাম দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। উপমন্যু চুপ করে গেছেন। গোটা গাড়িতে একটা কথাও বললেন না। কেমন শান্ত সমাহিত হয়ে রাস্তা দেখে গেলেন। লাহিড়ী বিরক্ত করলেন না।

অনমিত্র ঘোষের বালিগঞ্জে বেশ বড় বাড়ি। লাহিড়ী সে বাড়ির বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন, "চলুন স্যার"।

উপমন্যু গাড়ি থেকে নামলেন, "চল দেখি"।

অনমিত্র বাড়িতেই ছিলেন। উপমন্যুকে দেখে একগাল হাসলেন, "আমার যে কী সৌভাগ্য আপনি আমার বাড়ি পদধূলি দিলেন। আপনার কেসটা নিয়েই তো এখন মিডিয়া চর্চা করে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীকেই দোষী করে ফেলেছে। আমি ভাবছি আমার নাম কখন উঠবে। আপনি দেখলাম প্রেসের আগেই চলে এসেছেন। ভাল দার্জিলিং চা আছে। আনাই?"

উপমন্যু বললেন, "আনান। আপনি আমাকে একটু বলবেন অরুণবাবু কি ঠিক ঠাক পেমেন্ট পেতেন?"

অনমিত্র বললেন, "পেতেন। আমার কোম্পানির লিগাসি কি আজকের? কত দিনের কোম্পানি। যখন সিডি এল, পাইরেসির জ্বালাতনে সবাই অতিষ্ট, সেই কঠিন সময়টাও যখন আমরা টিকে গেছি, তারপর আশা করি আর অসুবিধে হবে না। এখন কপিরাইট নামক হাতিয়ারের যুগে আমরা আবার আগের জায়গায় চলে এসেছি। অরুনবাবুর সঙ্গে আমাদের চুক্তি ছিল, উনি আমাদের এক্সক্লুসিভ শিল্পী ছিলেন। আমাদের বাইরে অন্য কোন কোম্পানির সঙ্গে উনি কখনো গান করেন নি। ফলত, আমাদেরও দায়িত্ব ছিল তার যেন খাওয়া পড়ার কোন অসুবিধে না হয়। সমস্যা হল তার ডিভোর্সের পরে। ম্যাডাম, অর্থাৎ ঋতুপর্ণা ম্যাডাম আমার সঙ্গে একদিন দেখা করে জানালেন অরুণবাবু একটা রেকলেস লাইফ লিড করছেন। আমি কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম। ম্যাডামের কথায় সেটা কনফার্ম হলাম। জানা গেল, ভদ্রলোক গণিকাগমন করে তার সমস্ত সেভিংস তো উড়িয়েইছেন, উলটে বাজারে অনেক দেনা করে ফেলেছেন। আমি ম্যাডামকে জানালাম যে ওর প্রাপ্য টাকা দিয়ে অরুণ কী করবেন, সেটা আমার হাতে নেই। তখন ম্যাডাম বললেন, তা সত্ত্বেও আমার একটা সামাজিক দায় থেকে যায় যেটা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। একটা লোক এভাবে টাকা নয় ছয় করবে... মানে ব্যাপারটা অনেকটা আমি কি একটা লোককে নেশা করতে উৎসাহ দিতে পারি ড্রাগসের? সেরকম ধরে নিন। অগত্যা আমি একটা অন্য পথ নিলাম। আমার সি একে নির্দেশ দিলাম

অরুণের রয়্যালটির টাকা কমিয়ে দিতে। একটা ভাগের টাকা অরুণ তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেতেন, অন্য ভাগটা আমরা সি এস আর অ্যাক্টিভিটিতে দিতাম"।

উপমন্যু বললেন, "কর্পোরেট সোশ্যাল রেওসপন্সিবিলিটি? এভাবে আপনারা কারো প্রাপ্য টাকা চেপে যেতে পারেন নাকি?"

অনমিত্র বললেন, "যেতে হয়েছিল। অন্যায় তো বটেই। আমি মন থেকে সায় পাই নি। কিন্তু ম্যাডাম এমন রিকোয়েস্ট করে যেতে লাগলেন, আমার আর উপায় রইল না। কিন্তু শেষতক আমি পারলাম কোই? একরাতে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন অরুণদা। আমার হাতে পায়ে ধরে বললেন যেভাবেই হোক আমাকে তিন লাখ টাকা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাজারে তার ভয়াবহ দেনা হয়ে গেছে। আমি আর পারি নি, দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম"।

উপমন্যু বললেন, "আপনি এটা আমাদের জানান নি কেন?"

অনমিত্র বললেন, "জিজ্ঞেস করলে তবেই জানাবো ঠিক করেছিলাম। এটা নিয়ে হইচই হবার কিছু ছিল না। ওই তিন লাখ মত পেমেন্টই আমরা চেপে গেছিলাম"।

উপমন্যু বললেন, "সে টাকা অ্যাকাউন্টসে কী হিসেবে দেখালেন?"

অনমিত্র বললেন, "লোন দেখিয়েছি। পরে রাইট অফ করে দেবো"।

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, "আমি জানি না আপনি কী স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলেন, আপনার কি মনে হয়, এভাবে হিসেব এলোমেলো করে চলতে পারবেন?"

অনমিত্র হাসলেন, "বুঝে নেবো, ওসব দেখার জন্য সি এ আছে অফিসার। আমি আপনাকে দাদার ব্যাপারে মিথ্যে বলতে চাই নি। আপনার উপর বিশ্বাস আছে বলে সবটা বলে দিলাম। আশা করব সত্যিটা বলেছি বলে এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে কোন সমস্যায় পড়ব না"।

উপমন্যু বললেন, "তা হয়তো পড়বেন না, তবে... ঠিক আছে... আপনার পাঠা, আপনি কোনদিকে কাটবেন আপনি ভাল জানেন। এই তিন লাখ টাকার ব্যাপারে ম্যাডামকে বলেছিলেন?"

অনমিত্র মাথা নাড়লেন, "না। তবে ঐ টাকা ওড়াতে ওর বেশিদিন লাগে নি। তারপর আবার এসেছিলেন। বাজারে নাকি দশ লাখ দেনা করেছেন আবার। আমি সে টাকা আর দিতে পারি নি। দেওয়া সম্ভব ছিল না"।

চা এল। অনমিত্র বললেন, "প্লিজ অফিসার। এই চা টেস্ট করে দেখুন। এসবের টেস্ট আলাদা"।

১৯

চা সত্যিই ভাল। লাহিড়ী আর উপমন্যু, দুজনেই বেশ তৃপ্তি করে খেলেন।

অনমিত্র বললেন, "একটা সময় ছিল, যখন মনে হয়েছিল এবার ব্যবসা গোটাতে হবে। চারদিকে পাইরেটেড সিডি, ডিভিডি ছেয়ে গেল, পাকিস্তানি সাইটগুলো গান আপলোড করে দিল, সে এক ভয়াবহ সময় গেছে। এই ইউটিউব বলুন, স্পটিফাই বলুন, এরা এসে মার্কেটটা অনেক বাঁচিয়ে দিয়েছে। সব থেকে বড় কথা লোকে যখন দেখছে পাঁচ সেকেন্ড বা কুড়ি সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন দেখেও গান শোনা কোন এক অজানা পাকিস্তানি সাইটের থেকে অনেক নিরাপদ, তখন ওসব সাইটে তারা আর যাচ্ছে না। আমরা বেঁচে গেলাম, ব্যবসাটাও বেঁচে গেল। এখন কেউ আন অথোরাইজ ওয়েতে গান আপলোড করলে কপিরাইট খায়, চ্যানেল উড়ে যায়..."

উপমন্যু বললেন, "ফলে আপনাদের রেভিনিউটা থেকে যাচ্ছে। সমস্যা কম হচ্ছে"।

মাথা নাড়লেন অনমিত্র, "সত্যি কথা বলতে কী, ঘটনাটা এটাই"।

উপমন্যু বললেন, "সিডি বা ডিভিডি সেল কেমন ছিল অরুণবাবুর?"

অনমিত্র বললেন, "এক কালে ছিল। সেটা থেকে এমন কিছু আসতো না। তবে সে সময় উনি অনেক প্রোগ্রাম করতেন, ফলে রোজগার নিয়ে চিন্তা করতে হয় নি"।

উপমন্যু বললেন, "আপনার কী মনে হয়, ওর কেমন শত্রু ছিল? প্রফেশনাল লাইনের কেউ কি এই কাজ করতে পারে?"

অনমিত্র বললেন, "শত্রু নাকি জানি না তবে অর্ণব সরকারের সঙ্গে ওর রেষারেষি ছিল। অরুণ একটা সময় আমাকে বার বার বলে রাখতেন অর্ণব যেন বেশি প্রোগ্রাম না পায়। অ্যাক্টিভলি এসব দেখতেন"।

উপমন্যু চায়ের কাপ টেবিলের উপর রেখে বললেন, "আর আপনি ওর কথা শুনে অর্ণবকে সাইড করে দিয়েছিলেন?"

অনমিত্র বললেন, "উপায় ছিল না। সিনেমার গান করেছিলেন বলে অরুণদার বাজার ভাল ছিল। অর্ণব তখনো প্রতিষ্ঠা পায় নি। ফলে অরুণদার ইনসিকিউরিটিটা আমাকে ইউজ করতে পেরেছিল তখন। আমার বাবা বম্বে দেখত। পরে জানতে পারেন। আমাকে বকাবকিও করেন। একটা সময় আমি নিজে অর্ণববাবুর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা রি কনসাইল করতে চাই। দুঃখের বিষয়, অর্ণব আমাকে পরিষ্কার বলে দেন তিনি এই জঘন্য লাইনে আর আসতে চান না। ছেড়ে দিয়েছেন সব"।

উপমন্যু ম্লান হেসে লাহিড়ীকে বললেন, "দেখেছো, এই লাইনটায় কী লেভেলের পলিটিক্স হয়?"

অনমিত্র বললেন, "পলিটিক্স আর কী দেখলেন? সে পলিটিক্সের গল্প করতে গেলে ভোর হয়ে যাবে। তবে যেহেতু চাকরি নয়, গান করেই পেটের ভাত আসে, তাই সামনে হাসা হাসি করলেও অনেক শিল্পীই ভেতরে ভেতরে মারাত্মক রাজনীতি করেন। অরুণদা ইজ নট অ্যান এক্সেপশন"।

উপমন্যু বললেন, "তারপর অর্ণব তো মারা গেলেন"।

অনমিত্র বললেন, "আমিও শুনেছি। কিন্তু তখন আমি সিঙ্গাপুরে একটা মিটে গেছিলাম। পরে এসে জানতে পারি। আমার আর সেটা ফলো আপ করা হয় নি"।

উপমন্যু বললেন, "অর্থাৎ অর্ণব বেঁচে থাকলে হয়তো আমরা ওকে সাসপেক্ট লিস্টে রাখতাম, এখন তার প্রশ্নই নেই"।

লাহিড়ী বললেন, "অর্ণবের ছেলে বা মেয়ে... প্রতিহিংসাবশত কাজটা করে যদি?"

উপমন্যু লাহিড়ীর পিঠ চাপড়ে দিলেন, “গুড কোয়েশ্চেন”।

অনমিত্র বললেন, “একটা ছেলে আছে সে … স্বাভাবিক না আর কী। তার পক্ষে এসব করা সম্ভব বলে মনে হয় না”।

লাহিড়ী বললেন, “ওহ হ্যাঁ, এটা আমিও শুনেছিলাম”।

অনমিত্র বললেন, “এই লাইনে আর তেমন কেউ নেই যাকে সন্দেহ করা যাবে”।

উপমন্যু হঠাৎ করে বললেন, “ঋতুপর্ণা ম্যাডামকে সন্দেহ করা যায় কি?”

অনমিত্র একটু চমকে উঠে বললেন, “সেটা আমি বলতে পারবো না। অতো কন্ট্যাক্টও নেই ওর সঙ্গে আমার। তবে মিডিয়া তো ওকে অনেকটা দোষী করেই দিয়েছে। কাল দেখছিলাম জনমত সমীক্ষায় ঋতুপর্ণা পঁচাত্তর শতাংশ ভোট পেয়েছেন”।

উপমন্যু হেসে উঠলেন, “ওহ, পাবলিক পোল গোয়েন্দার কাজও করে দিচ্ছে? এই জন্য দেশটার এই হাল হয়েছে। দোষী বা নির্দোষ বড় কথা না, বেশি শতাংশ মানুষ কাকে ভোট দিচ্ছে সেটা বড় কথা! কী ভয়ংকর দিন আসছে”!

অনমিত্র বললেন, “সত্যিই তাই। আজকাল বড্ড ভয় হয় যাই বলুন”।

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, “যা বলেছেন। চল লাহিড়ী। এবার অন্য খোঁজে বেরোনো যাক”।

২০

বেল বাজাতে প্রত্যুষা দরজা খুললেন। তাদের দেখে বললেন, “আসুন”।

বাড়িটা ছোট। বসার ঘরটা ঘুপচি। ছোট ছোট দুটো সোফা। একটা ছোট টিভি ওয়াল মাউন্টিং করা আছে। দেওয়ালে একজন বয়স্ক লোকের ছবি।

উপমন্যু বললেন, “ইনি?”

প্রত্যুষা বললেন, “আমার শ্বশুর”।

উপমন্যু বললেন, “আর আপনার হাজব্যান্ড”?

প্রত্যুষা বললেন, “অনেক দিন নিখোঁজ। কোনভাবেই যোগাযোগও হয় নি”।

উপমন্যু বললেন, “ক বছর সংসার করেছিলেন?”

প্রত্যুষা বললেন, “দু বছর। একদিন সকালে বাজার যাবে বলে বেরোল, আর ফেরে নি। সেভিংস ছিল কিছু। তারপর...”

উপমন্যু বললেন, “আর শ্বশুর শাশুড়ি?”

প্রত্যুষা বললেন, “দুজনেই অনেক আগেই চলে গেছেন”।

লাহিড়ীর মুখটা ছোট হয়ে গেল। উপমন্যু বুঝলেন লাহিড়ী চাকরিতে নতুন। এখন দয়ামায়া বেশি। নিজের প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে গেল। প্রত্যুষার দিকে ফিরলেন তিনি, “আপনার সঙ্গে অরুণবাবুর দেখা হয়েছিল কী করে?”

প্রত্যুষা বললেন, “আমায় একজন যোগাযোগ করেন। ওর বাড়িতে দিয়ে আসা হয়েছিল আমায়। এক রাত থেকেছিলাম। তখন থেকে নিয়মিত গেছি”।

উপমন্যু বললেন, “কখন যেতেন আপনি”?

প্রত্যুষা বললেন, “রাত সাড়ে এগারোটায় পিক আপ হত”।

উপমন্যু বললেন, “আপনি দিনে ঘুমোন?”

প্রত্যুষা মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ। রাত জাগার মানসিক এবং শারীরিক প্রস্তুতি নিতে হয়। এমনিতেও এখন আর ঘুম হয় কোই? ক্লায়েন্ট না থাকলে জেগে বসে থাকি। রাতে আর ঘুম আসে না”।

উপমন্যু বললেন, “অল্টারনেট কিছু ট্রাই করেন নি?”

প্রত্যুষা কয়েক সেকেন্ড উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার মনে হয় এই সময়ে চাকরি পাওয়াটা এত সোজা? হ্যাঁ পাওয়া যেতো হয়ত খুঁজলে। এক বছর ধরে খুঁজে যেতে হত। ওই খোঁজার সময়টুকু ছিল না। আমার কাছে সময় কম ছিল। আমার বরের অনেক ধার দেনা ছিল আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি নি”।

উপমন্যু ভ্রূ কুচকালেন, “আপনার বরেরও ধার দেনা ছিল? তিনি কি হেমন্তের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিতেন নাকি?”

প্রত্যুষা চমকালেন, “আপনি চেনেন ওকে?”

উপমন্যু বললেন, “বাদ দিন। আপনি বলুন। হেমন্ত কত টাকা পেত?”

প্রত্যুষা বললেন, “চার লাখ। ই এম আই ছিল চল্লিশ হাজার টাকা। আমার তখন মরণ বাঁচন অবস্থা। দিনে রাতে বাড়িতে লোক আসছে। পাড়ার লোকেদের সামনে চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে। কত কাঁদবো? কেঁদে তো সেই পরিস্থিতি থেকে বেরনো যেতো না, তাই না?”

উপমন্যু বললেন, “আপনার সঙ্গে শেষ দেখা কবে হয়েছিল অরুণবাবুর?”

প্রত্যুষা বললেন, “তিন দিন আগে। ওর বাড়ি গেছিলাম”।

উপমন্যু বললেন, “কেমন মুড ছিল?”

প্রত্যুষা বললেন, “স্বাভাবিক। যেমন থাকে। আমরা অনেকক্ষণ গান শুনলাম। ওর সঙ্গে গান শুনতে হত, কখনো ওর গানে গলা মেলাতে হত। এরকমও হয়েছে একটা গোটা রাত আমরা ড্রইং রুমে শুধু গান শুনে কাটিয়েছি”।

প্রত্যুষা কেঁদে ফেললেন হঠাৎ করেই, “এরকম একজন মানুষ বিরল স্যার। আমি বলে বোঝাতে পারবো না উনি কত ভাল মানুষ ছিলেন। এই লোকটা চলে গিয়ে সব শেষ হয়ে গেলো আমার। আমি ঘর থেকে বেরোতে পারি নি আর, ক্লায়েন্ট মিট তো ছেড়েই দিলাম। আমি কবে এই সব কিছু থেকে বেরোতে পারবো, আমি নিজেই জানি না”।

উপমন্যু সময় দিলেন। প্রত্যুষা সামলে নিলেন মিনিট তিনেকের মধ্যে। উপমন্যু বললেন, “আপনি কাউকে সন্দেহ করেন? আপনি যখন ওর বাড়িতে যেতেন, কোন হুমকি ফোন আসতো?”

প্রত্যুষা বললেন, “তা নয়, তবে মাঝে মাঝে রাত দুটো নাগাদ একটা ফোন আসতো। উনি অন্য ঘরে চলে যেতেন। যখন ফিরতেন তখন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যেতেন। গল্প না করে চুপ করে শুয়ে পড়তেন। ওই ফোনটা এলে...”

প্রত্যুষা চিন্তিত মুখে বললেন, “নাম আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম জানেন? কে ফোন করেছে? উনি বলতেন চিনবে না”।

উপমন্যু লাহিড়ীকে বললেন, “ফোন রিপোর্ট এসেছে?”

লাহিড়ী বললেন, “হ্যাঁ”।

উপমন্যু প্রত্যুষার দিকে তাকালেন, “হুমকি দিত বলে মনে হয়েছিল?”

প্রত্যুষা বললেন, “ঠিক কী বলত আমি জানি না। অন্য ঘরে চলে যেতেন বলে কিছুই বুঝতাম না”।

উপমন্যু বললেন, “আপনার স্টেশন লিভ করার কোন প্ল্যান নেই তো?”

প্রত্যুষা বললেন, “না। আমি কোথায় আর যাবো? খুব বেশি হলে যদি আবার কাজ শুরু করি, সেক্ষেত্রে যেতে হতে পারে”।

উপমন্যু বললেন, “আমাদের জানিয়ে যাবেন। চল লাহিড়ী”।

২১

।।পূর্ব কথা।।

তমালতরু কড়া পরিচালক। ডিসিপ্লিন্ড। পাংচুয়াল। দেরী হলেই চিৎকার শুরু করেন।

মেক আপ রুমে বসে ঋতুপর্ণা তৈরী হচ্ছিলেন, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শট, তন্দ্রা এসে বলল, "দাদা এসেছে"।

ঋতুপর্ণা ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন, "এখানে?"

তন্দ্রা বলল, "হ্যাঁ। বলছে তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "পাঠিয়ে দে"।

মেক আপ আর্টিস্টকে বললেন, "আমি ডাকছি তোমায়"।

ঘর খালি হয়ে গেল।

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "শুনলাম আমি কী টাকা পাবো না পাবো, সেসব ব্যাপারে তুমি অনমিত্রের সঙ্গে কথা বলছো? আমায় সাবোতাজ করছো কেন তুমি?"

ঋতুপর্ণা ঠান্ডা গলায় বললেন, "তোমার ভালোর জন্যই করেছি যা করার। তুমি যেরকম দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছো, শেষ বয়সে তো আর খেতে পাবে না"।

অরুণ বললেন, "সেটা আমি বুঝবো। আমার হেডেক। আমাকে বুঝতে দাও"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "বুঝতে পারছো না তুমি। সেভিংসে তোমার বারো লাখ ছিল। খেয়ে ফেলেছো, লোন করছো আজেবাজে জায়গা থেকে। কতবড় সর্বনাশ হবে সেটা বুঝেছো?"

অরুণ বললেন, "আমার ঠেকা নিতে কে বলেছে তোমাকে? লাথ মেরে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছো। ল্যাংটো হয়ে নেচে বেড়াচ্ছো, আমি কিছু বলেছি কোনদিন সেসব নিয়ে? তুমি আমাকে টার্গেট করেছো কেন?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "এটা আমার ওয়ার্ক প্লেস। আশা করবো এমন কোন সিন ক্রিয়েট করবে না যেটা আমার সমস্যা তৈরী করে। তুমি এখন যাও। আমার কল হয়েছে। আমি পরে কথা বলবো"।

ঋতুপর্ণার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে নক হল। তমালতরু বাইরে থেকে চিৎকার করলেন, "এসো ঋতু, কী করছ?"

অরুণ রাগী চোখে ঋতুপর্ণার দিকে তাকিয়ে দরজা খুলে বললেন, "আমি আছি। আমি কথা বলছি। আপনি পরে আসুন"।

তমালতরু বললেন, "মানে? হাউ ডেয়ার ইউ। আমার কাজের জায়গায় এসে আমাকে আপনি ঠিক করে দেবেন নাকি আমি কী করবো? বেরোন এখান থেকে"।

অরুণ ঋতুপর্ণার দিকে ফিরলেন, "এসব কুত্তা পুষছো নাকি তুমি আমাকে টাইট দেবার জন্য? ভাল তো!"

ঋতুপর্ণার কান মাথা লাল হয়ে গেল। বললেন, "তুমি যাও। প্লিজ যাও"।

তমালতরু কুত্তা শব্দটা নিতে পারেন নি। অরুণের কলার ধরলেন এসে, "কী হয়েছে? কী বললি তুই?"

অরুণ জোরে ঠেললেন তমালতরুকে। তমালতরু ছিটকে পড়লেন। পড়েই চিৎকার শুরু করলেন, "সিকিউরিটি, এদিকে কুইক"।

অরুণ রক্তচক্ষুতে বললেন, "কোথাকার দু টাকার পাবলিক, ডিরেক্টর হয়েছে! সাহস কত তোদের? কাকে তেল মেরে এ জায়গায় এসছিস তুই?"

সিকিউরিটি এসে গেছিল। একপ্রকার গলাধাক্কা দিয়ে অরুণকে বের করে দেওয়া হল।

ভিড় হয়ে গেছিল।

তমালতরুর কাছে গিয়ে ঋতুপর্ণা কেঁদে ফেললেন, "কিছু মনে ক'র না, আমার লাইফটা হেল হয়ে গেছে। ডিভোর্সের পরেও শান্তি নেই"।

তমালতরু বললেন, "তুমি এটাকে এলাউ করলে কেন? অনেক আগেই বের করে দেওয়া উচিত ছিল। এরপরে কিন্তু আমি ওকে একদম অ্যালাউ করবো না। আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "ঠিক আছে। এখন ফ্লোরে চল"।

তমালতরুর জামা ছিড়ে গেছিল। কনুইয়ের কাছে খানিকটা ছিলে গেছে। তিনি বললেন, "হাতে লাগছে। আমার ভাল লাগছে না ঠিক। এই টাইপের লোক আমার একবারে পোষায় না। এত বড় একজন শিল্পি ছিল, এখন এরকম অবস্থা কেন? তুমি কোন রিহ্যাবে রাখতে পারতে তো ওকে"। ঋতুপর্ণা বললেন, "আমি আর পারি নি। একসঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকাল রিহ্যাবের কথা মনে হয় বটে, কিন্তু সেটুকু এফোর্ট নেবার জোরও আর আমার মধ্যে নেই। আমি সত্যি আর পারছি না"।

তমালতরু বললেন, "সরিয়ে দাও। পারছো না আবার কি? পুলিশে আমার বন্ধু আছে, গাঁজা কেস দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। দিনের পর দিন জেলে থাকলে এসব পিস এমনিই ঠিক হয়ে যাবে"।

ঋতুপর্ণা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "না না। এসব আজেবাজে কথা ভেবো না প্লিজ। ওর যাই হোক, ওর বাবার কথাটা তো ভাবতে হবে। আমি এসব কিছু চাইছি না। প্লিজ রাগ কোর না"।

তমালতরু "হু" বলে চুপ করে গেলেন।

২২

।।পূর্ব কথা।।

রাত একটা। ঋতুপর্ণার কাছে ফ্ল্যাটের চাবি থাকে।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেখলেন রূপা বসে বসে ঢুলছে।

তিনি বললেন, "তুই ঘুমাসনি কেন? আমি তো বলেছিলাম রাত হবে"।

রূপা বলল, "ভয় লাগে দিদি। এত বাজে বাজে লোক চারদিকে, তুমি যতক্ষণ না ফেরো, ততক্ষণ আমার ভয় লাগে"।

ঋতুপর্ণা শ্বাস ছাড়লেন। রূপার একটা ভয়াবহ অতীত আছে। তার কাছে থাকলেও মাঝে মাঝে ওর প্যানিক অ্যাটাক হয়। ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক না। নরম গলায় বললেন, "তুই খেয়েছিস?"

রূপা বলল, "না। খাই নি। ভাল্লাগছে না"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "চলে আয়। খাবার গরম করে খেয়ে নেব চল"।

রূপা উঠল। ঋতুপর্ণা তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে নিলেন। রূপা খাবার বাড়ছে। ঋতুপর্ণা বললেন, "কেউ এসেছিল?"

রূপা বলল, "তাপসদা ফোন করেছিল। দু জন দেখা করতে এসেছিল। নিচ থেকেই আটকে দিয়েছে"।

তাপস ফ্ল্যাটের সিকিউরিটির দায়িত্বে আছে। ওকে বলা আছে ঋতুপর্ণা ফ্ল্যাটে না থাকলে কাউকে ঢুকতে দেওয়ারও দরকার নেই।

তমালতরু মেসেজ করেছেন, "যেটা বলেছিলাম, ভেবে দেখতে পারো"।

ঋতুপর্ণা উত্তর দিলেন না। এত রাতে উত্তর দেন না সাধারণত। টিভিতে একটা ডান্স প্রতিযোগিতার জাজ হবার অফার আছে। এতদিন ভাবছিলেন যাবেন না। এখন মনে হচ্ছে গেলেও হয়। ঘরে থাকলে সময় কাটে না। রূপার মত তারও বড্ড মন খারাপ লাগে।

অনীশ শিডিউল পাঠিয়েছে। সকাল ন'টায় কল টাইম। রাত এগারোটা অবধি শ্যুট। উইকেন্ডে নর্থ বেঙ্গলে আউটডোর। একদিন গ্যাপ দিয়ে মুম্বইতে যেতে হবে। শিডিউল দেখে বিরক্ত লাগছে। ক্লান্ত লাগছে। উপায় নেই। সব জেনেই কন্ট্রাক্টগুলো সই করেছিলেন। এখন আর ভেবে কী হবে?

অম্বর ভিডিও পাঠিয়েছে। "শেষের কবিতা"য় মেয়ে ঢুকেছে আজ। অম্বর প্রাইভেট ডিটেকটিভ। অরুণের পেছনে রাখা আছে ওকে। অরুণ কোথায় কখন যায় সব খবর থাকে। ঋতুপর্ণা নিজেও জানেন না অম্বরকে কেন রেখেছিলেন। অরুণের উপর তার ভালবাসা নেই।

তার মন খচখচ করে। মনে হয় অরুণ কী করছেন জানা দরকার। এই মেয়েটা বহুগামী। আর অরুণ তাকে সবাই দেখবে বলে পর্দায় আসতে দিতেন না। নিজের সম্পত্তি করে রাখার প্রবণতা, দখল করার প্রবণতা চরম ছিল। এই মেয়েগুলোর ক্ষেত্রে তো তেমন নেই? নাকি এদের ক্ষেত্রেও আছে?

ঋতুপর্ণা ঠিক করলেন অম্বরকে খোঁজ নিতে বলবেন, এখন এই মেয়েগুলো অন্য কোন ক্লায়েন্টের কাছে যায় নাকি দেখতে। সেটাও জানা দরকার। উত্তরপাড়ায় একটা প্রোগ্রাম পেয়েছিলেন অরুণ। এত মদ খেয়ে ফেললেন রাস্তায়, স্টেজেই উঠতে পারেন নি। একজন মহিলা শিল্পীকে মদ খেয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মেয়েটি ছাড়ে নি। বলেছে ছাড়বে না। ঋতুপর্ণার মাথা ধরে যায় মাঝে মাঝে। লোকটার এই অধঃপতনের জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয় আজকাল। সব বন্ধনমুক্ত হয়েও বেরোতে পারলেন কই?

খেয়ে উঠে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন ঋতুপর্ণা। তমালতরুকেও রাগিয়ে দিয়েছেন অরুণ। তমালতরু রাগ পুষে রাখতে পারছেন না। মাঝে মাঝেই ফুঁসে উঠছেন। তার কাছে ভ্যালিডেশন চাইছেন। তিনি কী ভাবছেন? ঋতুপর্ণা বলবেন, যাও, তোমার যেটা ইচ্ছে সেটা কর? সেটা সম্ভব? অরুণের রয়ালটি কমানোর দরকার ছিল। টাকায় যেমন টাকা আসে, একই ভাবে টাকায় টাকা যায়ও। যে কোন দিন পথের ভিখারি হয়ে যাবেন অরুণ। চোখের সামনে সেটা দেখবেন তিনি? হাত মুখ ধুয়ে উঠে বেডরুমে গিয়ে শুলেন। প্রায় দুটো বাজে। ডার্ক সার্কেলে বড় ভয় তার। এত রাত করে ঘুম হচ্ছে রোজ, ঘুম কমও হচ্ছে, বিভিন্ন দুঃস্বপ্ন হানা দিচ্ছে মাঝরাতে, ডার্ক সার্কেল আসতে বেশি সময় নেবে না আর। কী হবে যদি কাল থেকেই সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়? নিরাপত্তাহীনতা তো তারও আসে। নিয়ম মাফিক চাকরি তো নয়। এত উঁচু তলায় ফ্ল্যাট, গাড়ির ই এম আই সব তো তাকেই দিতে হয়। ফ্ল্যাট মেইন্টেনেন্স কস্টও অনেক মধ্যবিত্ত মানুষের ফ্ল্যাটের ই এম আইয়ের টাকার সমান। তখন কী করবেন তিনি? রাত হলেই ভয় বুকে চেপে বসে।

ঘুম আসে না। ডার্ক সার্কেল আসবেই একদিন। ঋতুপর্ণা চোখ খুলে শুয়ে রইলেন...

২৩

।।বর্তমান সময়।।

সন্ধ্যেয় অফিসে ঢোকার আগে প্রেস সামলাতে সামলাতে ফোন পেলেন উপমন্যু। ঋতুপর্ণা ফোন করছেন। উপমন্যু সঙ্গে সঙ্গে ভিড় থেকে সরে গিয়ে ফোন রিসিভ করলেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল অফিসার। ফোনে বলা কি ঠিক হবে?"

উপমন্যু সচকিত হয়ে বললেন, "দরকার নেই, আপনি কোথায় আছেন?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "দামানিতে। অসুবিধে হবে"?

উপমন্যু বললেন, "একবারেই না। আমাকে আধঘণ্টা দিন। আসছি"।

ফোন রেখে উপমন্যু লাহিড়ীকে ইশারা করলেন। লাহিড়ী তড়িঘড়ি জিপে বসলেন। উপমন্যু বসতে লাহিড়ী বললেন, "কী ব্যাপার স্যার?"

উপমন্যু বললেন, "স্টুডিও পাড়া। তোমার কি বাড়ি যাবার কোন ব্যাপার আছে? তাহলে যেতে পারো"।

লাহিড়ী বললেন, "না না। কোন তাড়া নেই"।

উপমন্যু বললেন, "বিয়ে কর নি না?"

লাহিড়ী বললেন, "না স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "ওই জন্যই। ঠিক আছে চল"।

তারা পৌঁছলেন যখন, ঋতুপর্ণার শুট শেষ হয়ে গেছে। একটা আলাদা ঘরে বসার ব্যবস্থা করা গেল। ঋতুপর্ণা বললেন, "চা বলি?"

উপমন্যু বললেন, "সে বলতে পারেন"।

ঋতুপর্ণা চায়ের জন্য বলে এসে বসলেন, "আমি আরেকটা কথা বলার জন্য ডাকলাম। ফোনে বলা যেত, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ফোন ট্যাপ হয় নাকি। মানে একটু সেনসিটিভ ব্যাপার তো"।

উপমন্যু বললেন, "কেমন সেনসিটিভ?"

ঋতুপর্ণা একটু থেমে, সময় নিয়ে বললেন, "তমালতরুর নাম শুনেছেন?"

লাহিড়ী বলে উঠলেন, "হ্যাঁ ডিরেক্টর। সম্প্রতি অজানার খোঁজে নামের একটা সিনেমা সুপারহিট হয়েছে। আপনিও তো আছেন..."।

ঋতুপর্ণা মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, সুপারহিটের থেকেও বেশি। ব্লকবাস্টার বলা যায়। অ্যাকচুয়ালি ওর সঙ্গে ওই সিনেমার শুটিঙের সময় অরুণের একটা হাতাহাতি মতন হয়। অরুণ আমার সঙ্গে ঝামেলা করতে এসেছিল, তমাল সে সময়টা এসে পড়ে। অরুণ হাত চালিয়ে দেয়। পরে তমাল আমাকে বলেছিল ওর কোন আত্মীয় আছে পুলিশে, তাকে দিয়ে গাঁজা কেস দিয়ে দেবে অরুণকে। আমি বাধা দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, তমাল ওই অপমানটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না"।

উপমন্যু বললেন, "গাঁজা কেস দেবে, সেটা আপনাকে বলছিল কেন?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়েছিল। সম্ভবত সম্মতি চাইছিল। আমি রাজি হলেই দিত এরকম ধরণের কথা। সমস্যা হল আপনি যদি ওকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন তাহলে ওর সন্দেহ আমার উপরেই আসবে। তমাল আমার ভাল বন্ধু। ডিসেন্ট ছেলে, একটু গোঁ বেশি এই যা। কোনোভাবে ব্যাপারটা..."

উপমন্যু বললেন, "হাতাহাতিটা তো সবার সামনেই হয়েছিল, তাই তো?"

ঋতুপর্ণা বললেন, “হ্যাঁ। তা হয়েছিল”।

উপমন্যু বললেন, “ওর ফোন নাম্বারটা দিন। সেটা যে আপনি দিয়েছেন, তা আমি বলবো না। চিন্তা নেই। আর আপনি ভাববেন না, এ কথা আপনি আমাকে বলেছেন ও জানবে না”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “বুঝতেই পারছেন...”

উপমন্যু বললেন, “একবারে। চিন্তা করবেন না”।

ঋতুপর্ণা তমালতরুর ফোন নাম্বার বললেন। উপমন্যু ফোনে সেভ করে নিয়ে বললেন, “আর কিছু মনে পড়ছে? ছোটখাটো কোন ব্যাপার?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “আমার রিক্রুট করা একজন ডিটেকটিভ আছে। ওকে আমি অরুণের খবরাখবর নেওয়ার জন্য রেখেছিলাম। অরুণ কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, সেসব খবর আমাকে ও দিত। অম্বর। আমি অরুণকে নিয়ে ওয়ারিড ছিলাম অফিসার”।

উপমন্যু বললেন, “চিনি। বাচ্চা ছেলে। আপনি আইন বহির্ভূত কিছু করেন নি। কারো ব্যাপারে চিন্তা করতেন বলেই খবর নিতেন। এতে সমস্যা হবে না। টেক কেয়ার, গুড নাইট”।

ঋতুপর্ণা মাথা নিচু করলেন, “গুড নাইট অফিসার”।

গাড়িতে ফিরে উপমন্যু তমালতরুকে ফোন করলেন। প্রথমে তমালতরু ধরলেন না। পরের বার একজন ফোন তুলে বলল, “কে বলছেন?”

উপমন্যু বললেন, “সি আই ডি থেকে বলছি। তমালতরু বাবু বলছেন?”

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর অন্য একটা কণ্ঠস্বর বলল, “বলুন”।

উপমন্যু বললেন, “আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। সময় দেওয়া যাবে?”

ও প্রান্ত থেকে সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “কী ব্যাপারে?”

উপমন্যু বললেন, “অরুণ মুখার্জি মার্ডার কেস”।

“তাতে আমি কী করবো?”

“রুটিন কথাবার্তা। বেশিক্ষণ নেবো না। কাল টাইম হবে?”

“এখন কথা বলবেন? আমার এসব টেনশন পোষায় না। আমি লোকেশন পাঠালে আসতে পারবেন?”

“শিওর”।

“থ্যাঙ্ক ইউ”।

ফোন রেখে উপমন্যু বললেন, “বিচ্ছেদের পরেও অম্বরকে অরুণের পেছনে পাঠানো। ইন্টারেস্টিং। মেয়েলি কৌতূহল নাকি সত্যিই কেয়ার করতেন?”

লাহিড়ী বললেন, “স্যার বিয়ে জিনিসটা ভয়ের, চাপ লাগছে এবার”।

উপমন্যু হেসে ফেললেন।

২৪

“আমি জানতাম ডেকে পাঠানো হয় আপনাদের দফতরে। এরকম বাড়িতে আসার ব্যাপারটা...”

তমালতরু বসেই এ কথাটা বললেন।

উপমন্যু বললেন, “ডেকে পাঠানোও হয়। আপনি সেটা চাইলে তার ব্যবস্থাও করতে পারি”।

তমালতরু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “না না। ঠিক আছে। আমি সব রকম সহায়তা করতে রাজি আছি। আমার তো কোন ব্যাপার না। আমি কেন সাহায্য করব না? আমার নিজেরও খারাপ লেগেছে। লোকটার সঙ্গে একটা ছোটখাটো ঝামেলা হয়ে গেল”।

উপমন্যু বললেন, “হ্যাঁ, সে ব্যাপারেই জানতে এসেছি। কী হয়েছিল?”

তমালতরু বললেন, “আমি ভীষণই সিরিয়াস, কাজের ব্যাপারে আমার কোন রকম বাধা ভাল লাগে না। সেদিন ঋতু দেরী করছিল, আমি ডাকতে যেতেই অরুণ অসভ্যতা শুরু করলেন। ওই সময়টা একটা সেনসিটিভ সময়। আমার কাজের সময় কেউ এরকম করলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। কিন্তু উনি যে আমার গায়ে হাত তুলতে পারেন আমি ভাবতে পারি নি”।

চার পাঁচ বছরের বাচ্চা হাঁটতে হাঁটতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। তমালতরু বললেন, “দাঁড়ান, আমার ছেলে চলে এসেছে। ওকে দিয়ে আসি”।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘরের ভেতরে দিয়ে এসে তমালতরু বললেন, “সবে একটু দাঁড়াতে চেষ্টা করছি আমি, একটা দুটো কাজ সাকসেস পেয়েছে, এর মধ্যে যদি এসব উটকো ঝামেলা চলে আসে... বুঝছেন তো?”

উপমন্যু বললেন, “অরুণবাবুর গান শোনেন আপনি?”

তমালতরু বললেন, “আমার বাবা মা খুব রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন। ওরা শুনতেন। আমার কোনকালেই অরুণের গান খুব একটা ভাল লাগে না”।

উপুমন্যু বললেন, “সেদিনের ঘটনায় আপনার মনে প্রতিশোধস্পৃহা আসেনি? মনে হয় নি এবার শায়েস্তা করতে হবে অরুণকে? এত সাহস পায় কী করে?”

তমালতরু হেসে ফেললেন, “হ্যাঁ, তা তো হবে। আমিও তো মানুষ। আমার জায়গায় যে কেউ থাকলে তারও হত। আপনারও হত। কিন্তু তা বলে আমি অতো এক্সট্রিম কিছু করবো না”।

উপমন্যু বললেন, “সেটা ভ্যারি করে কার রাগ কত দূর অবধি যেতে পারে সেটার উপরে। আপনার এখন কোন কাজ নেই?”

তমালতরু বললেন, “এই মুহূর্তে কিছু নেই। একটা কাজের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, লাস্ট প্রোজেক্টটা হিট হয়েছে, তাই ডিমান্ড আছে আপাতত”।

উপমন্যু বললেন, “আপনার কাউকে সন্দেহ হয় অরুণবাবুর কেসে?”

তমালতরু বললেন, “আমার? সেরকম স্পেসিফিকালি কিছু মনে হয় না, তবে উনি বেশ ভালনারেবল হয়ে গেছিলেন। আমার মত অনেককেই রাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কিছু করেছে নাকি সেটা সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা নেই। আমি ভাবতেও চাই না অ্যাকচুয়ালি। আমি দেখেছি কারো সম্পর্কে বেশি ভাবতে গেলে আমি আর নিজের কাজে মন বসাতে পারি না। সেটা আমার পক্ষে ক্ষতিকর”।

উপমন্যু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “ওকে। আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। গুড নাইট”।

তমালতরু বললেন, “মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি। আপনি যখন ফোন করলেন একটু ঘাবড়েই গেছিলাম। বুঝতেই পারছেন সবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি, এখন যদি উটকো ঝামেলায় পড়ে যাই তাহলে খামোখা কত আজে বাজে সমস্যা তৈরি হবে”।

উপমন্যু বললেন, “তা তো ঠিকই। ঋতুপর্ণার সঙ্গে কি আপনার এই কাজের সূত্রেই আলাপ?”

তমালতরু বললেন, “হ্যাঁ। এই কাজটার সময়েই স্পেসিফিকালি। তবে ঋতুপর্ণা বাকিদের মত না। রিজার্ভ থাকে, নিজের কাজের বাইরে বাজে কথা বলে না। আমার এরকম কাউকেই দরকার ছিল। সময়ের ঠিক নেই, কাজে এসে ফালতু ফোনে কথা বলে সময় নষ্ট করে যাবে এরকম কেউ থাকলে সমস্যা বাড়ে। আমিও মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আনফরচুনেটলি সেদিন অরুণ এসেও আমার মানসিক শান্তিটা নষ্ট করে দিলেন। কী আর করা যাবে”...

তমালতরুর ছেলে আবার চলে এসেছিল। তমালতরু রেগে গিয়ে চিৎকার করা শুরু করলেন, “আরে, বাবু আবার বাইরে চলে এসেছে! কী করছ তোমরা? পাপিয়া... এই পাপিয়া”...

কেমন দৃষ্টিকটুভাবে চিৎকার করছেন তমালতরু। উপমন্যু আর দাঁড়ালেন না। লাহিড়ীকে বললেন, “চল, এবার অম্বরকে ধরা যাক”।

২৫

রাত সাড়ে এগারোটা।

পিয়ালী ফোন করছেন। উপমন্যু ধরলেন, “বল”।

“আজ কত রাত হবে? কিছু জানালে না তো?”

উপমন্যু বললেন, “আরও এক ঘণ্টা ধরে নাও”।

পিয়ালী বললেন, “ঠিক আছে”।

ফোন রাখলে লাহিড়ী বললেন, “অম্বর এখানেই আসবে বলেছে তো স্যার?”

টালিগঞ্জে সুলভের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়েছেন উপমন্যু। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, “হ্যাঁ। ও আসছে”।

লাহিড়ী বললেন, “ওর বাড়ি গেলেই তো হত”।

উপমন্যু বললেন, “ও চাইছে না। না চাইলে জোর করা ঠিক না। হতে পারে বাড়িতে গেলে সমস্যা হবে”।

বেশি দেরী হল না। বাইক নিয়ে অম্বর হাজির হল।

উপমন্যুকে দেখে বাইক দাঁড় করিয়ে প্রায় ছুটে এল, “আমি জানতাম স্যার আমার ডাক পড়বে। তৈরি ছিলাম”।

উপমন্যু বললেন, “তুমি এত দেরী করলে কেন? আমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলে? ঋতুপর্ণা যদি তোমার নাম না বলতেন?”

অম্বর বলল, “স্যার, আমাকে টাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। আমি কী করে ক্লায়েন্টের বিনা অনুমতিতে আপনাকে ফোন করি?”

উপমন্যু বললেন, “তা ঠিক। এবার বল দেখি অরুণের ব্যাপারে কী কী জেনেছিলে? আর খুনের সময়েই বা তুমি কোথায় ছিলে?”

অম্বর বলল, “খুন তো সকালের দিকে হয়েছে। আমি রাতের অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাক করতাম স্যার। মানে কোন মেয়েকে নিয়ে উঠল, কোথায় গেল, এসব খবর কালেক্ট করে ম্যাডামকে পাঠিয়ে দিতাম। যেদিন খুন হল, তার আগের রাতে বারোটা অবধি কোন অ্যাক্টিভিটি না দেখে আমি বাড়ি চলে যাই”।

উপমন্যু বললেন, “কেন? বারোটা অবধি কেন?”

অম্বর বলল, “এটাই প্যাটার্ন ছিল স্যার। রাত এগারোটা নাগাদ ওর বাই উঠত। খবর চলে যেত। ধরে নিন সাড়ে এগারোটা বারোটার দিকে হয় মেয়ে ঢুকতো, নয় নিজে বেরিয়ে গিয়ে কাউকে না কাউকে একটা তুলে আনতো। বারোটা অবধি কিছু না হলে রাতে আর নড়ত না”।

উপমন্যু বললেন, “বুঝলাম। তুমি কি করে জানলে সকালেই খুন হয়েছে?”?

অম্বর বলল, “রাত বারোটা অবধি হয় নি সেটা তো জানি। আমি জানলায় ছায়া দেখেছি অরুণবাবুর। খাবার আনিয়েছিলেন। রাতে বেরিয়ে পাড়ার কুকুরদের খাবারও দিয়েছিলেন”।

উপমন্যু বললেন, “কুকুরদের রেগুলার খাবার দিতেন?”

অম্বর বলল, “হ্যাঁ”।

লাহিড়ী উপমন্যুর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, “পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে স্যার। সকাল পাঁচটা থেকে সাতটা বলছে। গুলি করেই মারা হয়েছে। শরীরে আর কোন চিহ্ন নেই”।

উপমন্যু বললেন, “ওকে। অম্বর, যা বুঝতে পারছি ভোরের দিকে তুমি থাকলে সিসিটিভি না থাকার সমস্যাটা আমাদের হত না। তোমার না থাকাটাই সমস্যা হয়ে গেছে। বা তুমি হয়তো ছিলে। আমাদের বলতে চাইছো না। ছিলে কি?”

অম্বর জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “একবারেই না স্যার। আমি তখন বাড়ি চলে এসেছিলাম। আপনি ও দিন আমাদের পাড়ার সিসিটিভি রেকর্ড চেক করে দেখতে পারেন। এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হয় বলুন?”

উপমন্যু বললেন, “শুধু ডিটেকটিভগিরি, অর্থাৎ এর ওর তার পেছনে লোক লাগিয়ে যে টাকা পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে চলে যায় বল? অন্য কোন কাজ করতে হয় না”!

অম্বর বলল, “স্যার আর যাই করি চুরি, ডাকাতি, খুন, এসব আমি অন্তত করবো না। আপনি আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছেন স্যার”।

উপমন্যু অম্বরের কাঁধে হাত রেখে বললেন, “ঘাবড়াই নি। কেসটা অদ্ভুত একটা কেস হয়ে গেছে। আমি শুধু পসিবিলিটিগুলো চেক করছি। হতেই পারে ঋতুপর্ণা ম্যাডামের হাজব্যান্ডের উপর এত রাগ ছিল, হতে পারে ওর কেরিয়ারে অরুণ এতটাই এফেক্ট করছিলেন যে উনি শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ওকে সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে মনস্থির করে তোমাকে দায়িত্ব দেন। হয় তুমি, নয় তোমারই যোগাযোগ করা কোন এজেন্সির লোক...”

অম্বর বলল, “না না স্যার। ভুল ভাবছেন। ঋতুপর্ণা ম্যাডাম ওসব ভাবতে যাবেন না। উনি ঝামেলা পছন্দই করেন না তেমন”।

উপমন্যু বললেন, “তাই? ম্যাডামকে খুব চিনে ফেলেছো বলে মনে হচ্ছে”!

অম্বর বলল, “তা তো স্যার চিনেছি খানিকটা। অরুণবাবুকেই শুধু চিনতে পারি নি”।

উপমন্যু ভ্রূ কুঁচকালেন, “মানে?”

অম্বর ম্লান হাসল, “রোজ সকালে উঠে নিজের সঙ্গে নিজের বাজি ধরতাম। আজ কাকে ডাকবেন। প্রত্যুষা না অঙ্গীরা? নাকি আজ সঙ্গীতা আসবেন? কোন দিনও জিততে পারি নি স্যার। হয় কাউকে ডাকেনই নি। নয়তো আমার গেস মেলে নি”।

উপমন্যু বললেন, “এইসব নিয়ে কে বাজি ধরে?”

অম্বর বলল, “আমি স্যার”।

লাহিড়ীও হেসে ফেললেন।

অম্বর বলল, “অদ্ভুত টাইপের লোক একটা। শেষের দিকে মহিলা ছাড়া কিছু চিনতেন না। বেঁচে থেকে কী হত বলুন তো? একদিকে ভালোই হয়েছে। সোসাইটির প্রতি কোন কন্ট্রিবিউশন তো ছিল না লোকটার”।

উপমন্যু চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন, “তা আর কারই কোন কন্ট্রিবিউশন আছে? যাক গে, বাদ দাও। বাড়ি যাও। আর কিছু মনে পড়লে ফোন করবে”।

২৬

পিয়ালী জেগে বসে ছিলেন। উপমন্যু লজ্জিত মুখে ঘরে ঢুকে বললেন, "কেন যে জেগে থাকো!"

পিয়ালী বললেন, "অভ্যাস হয়ে গেছে। তোমার খবর কী? নৈনিতাল কি হচ্ছে না হবে না?"

উপমন্যু বললেন, "জানি না। এখনও ঘোর অনিশ্চয়তাময়। মেঘে ঢাকা ব্যাপার স্যাপার বলতে পারো। সেরকম কিছু ঠিক হয় নি"।

পিয়ালী বললেন, "বোঝো, এদিকে আমি সোয়েটার গোছাচ্ছি"।

উপমন্যু বললেন, "সেটা গোছাবে না কেন? গুছিয়ে রাখো"।

পিয়ালী বললেন, "খাও আগে। তারপর দেখা যাবে। উফ, কত ঝামেলা, লোকটা রিটায়ার করেও শান্তি দিলো না"।

উপমন্যু হাসতে হাসতে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে খেতে বসলেন। পিয়ালী বললেন, "লোকটা একবারে সুবিধের না, তাই না? খবরে অনেক কিছু দেখাচ্ছে"।

উপমন্যু বললেন, "কে যে সুবিধের, তাই তো বুঝতে পারি না"।

পিয়ালী বললেন, "তুমি আবার হেঁয়ালি করে কথা বলছো কেন? সোজাসুজি বলতে পারছ না?"

উপমন্যু অসহায় গলায় বললেন, "অদ্ভুত একটা কেস এটা। দেখতে সোজা লাগছে, একবারেই সোজা না"।

পিয়ালী বললেন, "তুমি এই কথা বলছো?"

উপমন্যু শ্বাস ছাড়লেন, "তাই তো দেখছি। ঠিক আছে, ভেবো না। দেখা যাক কী করা যায়"।

পিয়ালী বললেন, "দেখো। নৈনিতাল না হলে হোক, কিন্তু তুমি পারবে না এটা আমি মেনে নিতে পারবো না। তুমি তাড়াহুড়ো কোর না। আমি কোন প্রেশার দিয়ে ফেলছি নাকি?"

উপমন্যু বললেন, "না না। সেসব ভেবো না"।

পিয়ালী আর কিছু বললেন না।

খাওয়া হয়ে গেলে উপমন্যু নিজের ঘরে গিয়ে নোটবুক খুললেন।

নোটবুকে লিখলেন,

১) তমালতরু রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে? কিন্তু যদি নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে কি অরুণকে একবারে মেরে দেবে? মারলে ওর লাভ কী?

২) ঋতুপর্ণার গোপন কোন সম্পর্ক আছে? মিডিয়া সেটা দেখাচ্ছে। যদি সত্যি সম্পর্ক থাকে, তাহলে কে সে?

৩) হেমন্তকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিল। দু লাখ টাকার একটা ফাঁক থেকে গেছে। হেমন্ত ঠিক কতটা এগোয় টাকা তোলার জন্য? কাদের ইউজ করে?

লেখাটার দিকে চুপ করে চেয়ে রইলেন উপমন্যু। আরও অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে তার মাথায়, কিন্তু এখনই সেগুলো লিখতে ইচ্ছে করছে না। নোটবুক রেখে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল তার। উঠে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তৈরি হয়ে নিজের বাইক নিয়ে যখন বেরোলেন, তখন ভোর সাড়ে চারটে। শহর তখনো ঘুমোচ্ছে। শেষের কবিতার সামনে এসে বাইক বন্ধ

করলেন। বাড়িটা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অম্বর কোন জায়গা থেকে অপেক্ষা করতো? অম্বরকে এখানে নিয়ে আসার দরকার ছিল। কতক্ষণ দাঁড়াতো অম্বর? গেটের চাবি নিয়ে এসেছিলেন। চাবি খুলে গেট দিয়ে ঢুকলেন। গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির গেটের সঙ্গে দূরত্বটা মাপার চেষ্টা করলেন।

ভোর হচ্ছে। উপমন্যু ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে আরেকবার গেটের দিকে তাকালেন। গেট থেকে বাড়ির সদর দরজা অবধি তিন চারবার পায়চারি করলেন।

ছাদের দিকে লক্ষ্য করলেন। বাড়িটার সঙ্গে বাড়িটাকে ঘিরে থাকা প্রাচীরের দূরত্ব সব দিকে সমান। যে খুন করেছে সে প্রাচীর টপকে বাড়ির পেছন দিক থেকে পালাতে পারে। সেক্ষেত্রে সদর দিয়ে বেরিয়ে তাকে পেছনের দিকে যেতে হবে।

পেছনের দিকের প্রাচীর অবলীলায় টপকে ওদিকের রাস্তায় নামলেন। সরু রাস্তা পেরিয়ে আরেকটা বাড়ি শুরু হচ্ছে। সরু রাস্তাটা বাড়িটাকে ঘিরে আছে। সে বরাবর হাঁটতে হাঁটতে আবার গেটের কাছে পৌঁছে গেলেন তিনি।

ফোন বের করে অম্বরকে ফোন করলেন। অম্বর ঘুম চোখে ফোন ধরল, "হ্যাঁ স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "অম্বর, আমাকে একটা কথা বল, তুমি ঠিক কোন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে নজর রাখতে? বাড়ির সামনে না পেছনে?"

অম্বর ঘুম গলায় বলল, "এত ভোরে স্যার?"

উপমন্যু বললেন, "আমি এ বাড়িতেই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি কোথায় দাঁড়াতে? বোঝাতে পারলে বল নইলে চলে এসো"।

অম্বর ঘাবড়ে গেল, "এত ভোরে?"

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। আমি আসতে পারলে তুমিও আসবে। এসো। নাকি বলবে?"

অম্বর বলল, "গেটের উলটোদিকের ফুটে একটা গুমটি আছে স্যার। রাত দশটার পরে বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে লুকিয়ে থাকতাম"। উপমন্যুর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, "ঠিক আছে। ঘুমাও"।

অম্বর ভয়ে ভয়ে বলল, "জেল হবে নাকি স্যার?"

উপমন্যু বললেন, "ঘুমাও ঘুমাও"।

২৭

।।পূর্ব কথা।।

হেমন্ত টাকা গুনছিল। সাধন এসে দাঁড়াল। সাধন একাই এসেছে। সাধনকে দেখে হেমন্ত বলল, "কীরে? শিল্পী টাকা দেয় নি?"

সাধন বলল, "না দাদা। ছিল না। কোন মাগীকে নিয়ে নাকি দমদম গেছে। ফোন করলাম যখন প্রথমে ধরছিল না। প্রায় আধঘণ্টা পর ফোন করে বলল"।

হেমন্ত বলল, "সাত আটজন নিয়ে যা রাতে। গেট আটকে রাখ, ঘরে ঢুকতে না পারে। পাড়ার লোক জড়ো করে ফেল। সব শিখিয়ে দিতে হবে নাকি? নতুন শিখছিস?"

সাধন মাথা চুলকে বলল, "আমার বাপ এ লোকের গান শুনত দাদা। রোজ সকালে গান চালিয়ে দেয়। এঁকে চমকাতে কেমন লাগে"।

হেমন্ত হাসি হাসি মুখে সাধনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ন্যাকাচো কি গাছে ফলে? তোর বাপ রবীন্দ্রসংগীত শোনে বলে কী সারাদিন গানই শুনে বেড়ায়? তাহলে তুই আর তোর চারটে ছেলে মেয়ে কি আকাশ থেকে পড়ল?"

সাধন বলল, "শ্যামলকে পাঠাও দাদা। আমি একটু চাপে পড়ে যাই"।

হেমন্ত বলল, "না। তুইই যাবি। তুইই চমকাবি। আমি আর কাউকে পাঠাবো না। আমি দেখতে চাই কী কাজ শিখেছিস তুই। এই তো বিয়ে করেছিস, তোর বউয়ের কাছে তো তুইই যাস। শ্যামল যায় কি? যায়?"

সাধন মাথা নাড়ল, "না দাদা"।

হেমন্ত বলল, "তুই যাবি। আমি আর কোন কথা শুনব না"।

সাধন ব্যাজার মুখে বলল, "ঠিক আছে। যাচ্ছি। ভেবো না"।

মনটা খারাপই ছিল সাধনের। বাপটা কিছুদিন আগে মরেছে। বাপের স্মৃতির মধ্যে এই গানগুলোও আছে। সে লোকটাকে চমকাতে কেমন কেমন লাগে। অন্য কেউ হলে কিছু হত না। এ লোকটার গলা শুনে ঘুম ভেঙেছে। বাবার স্মৃতির মধ্যে এই লোকটার গলাও মিশে আছে।

পেটের ব্যাপার। সেন্টিমেন্ট দিয়ে পেট চলে না। রাত ন'টা থেকে লোকটার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল সে। আট ন'টা ছেলে জুটিয়ে নিয়ে এসেছিল। গাড়িতে সামনের সিটে একটা মেয়ে বসা। গাড়ি গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে অরুণ গেট খুলতে নামতেই তাকে ঘিরে ধরল তারা।

অরুণ বিরক্ত মুখে বললেন, "হেমন্ত পাঠিয়েছে, তাই তো?"

সাধন বলল, "হ্যাঁ। কবে দেবেন আর?"

অরুণ বললেন, "গিয়ে বলে দাও কাল নিয়ে যেতে। এভাবে পোষা কুকুরদের যেন না পাঠায়। আমি ঠিক দিয়ে দেবো"।

সাধন হকচকিয়ে গেল। অরুণ যে তাকে এই উত্তর দেবে তার প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু এ লোককে তো সে অন্যরকম ভেবেছিল। সে আসতে চাইছিল না। সে লোকটা তাকে কুকুর বলে দিল? এত সাহস?

সে চিৎকার করে উঠল, "এই শুয়োরের বাচ্চা, তোর এত বড় সাহস, তুই আমাকে কুকুর বললি?"

অরুণ বললেন, "কেন রে? তুই কী? রাস্তার কুকুরদেরও অধম তুই। গুণ্ডামি করে খাস, লজ্জা লাগে না? চল ফোট"!

আসলামরা টেনে ধরল বলে, নইলে সমস্যা হয়ে যেত। গটগট করে হেঁটে গেট খুলে গাড়িতে উঠে গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেলেন অরুণ।

সাধনের মাথায় রক্ত উঠে গেছিল। তাকে শান্ত করতে হেমন্তকে ফোন করতে হল। হেমন্ত ফোন ধরে বলল, "কীরে, তোকে যখন বলেছে কালকে টাকা দিয়ে দেবে, তুই ঝামেলা করতে গেলি কেন?"

সাধন বলল, "আমাকে কুকুরের বাচ্চা বলল। কেন বলবে? আমার বাবা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনত, আর আমাকে কুকুর বলে দেবে কেন? আমি লাশ নামিয়ে দেব দেখো"।

হেমন্ত বলল, "চুপচাপ চলে আয়। অনেক হয়েছে। এরকম হলে তোকে বাদ দিয়ে দেবো আমি। ক'দিন ধরেই দেখছি তোর কাজে মন নেই"।

সাধন ফোঁস করে উঠল, "আমি এখানে আসতে চাই নি। তুমি বললে আসতে। যখন ঝামেলা করতে যাচ্ছি আমাকে আটকে দিলে। কাল যদি টাকা না দেয় তখন কী হবে?"

হেমন্ত বলল, "তখন তুই জানিস কী করবি। তখন আমি আর বাধা দেব না। এখন চলে আয়"।

সাধন কিছুক্ষণ জোরে জোরে ফোঁস ফোঁস করে ফোন কেটে দিল। আসলাম তাকে ধরে নিয়ে বলল, "চল, বাড়ি ফের। বেফালতু ঝামেলা করিস না। কেস খেয়ে যাবি"।

বাইক স্টার্ট করে দিয়েছিল ওরা। আসলামের পেছনে বসে সাধন বেরিয়ে গেল।

অম্বর ঘাপটি মেরে বসে ছিল। গোটা ঝামেলাটার সময় একবারও বেরোয় নি। চুপ করে রেকর্ড করে গেছে। ভিডিওটা ঋতুপর্ণাকে পাঠিয়ে দিল।

২৮

।।বর্তমান সময়।।

সকাল সাতটায় বাড়ি ফিরে এলেন উপমন্যু।

পিয়ালী উঠে গেছিলেন। উপমন্যুকে ঢুকতে দেখে বললেন, "শেষ রাতেই কেস সলভ করে দিলে নাকি?"

উপমন্যু বললেন, "লাহিড়ীর জন্যেও চা বসাও। ওকে ডেকেছি"।

পিয়ালী বললেন, "ঠিক আছে। এখনই আসবে?"

উপমন্যু ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ"।

পিয়ালী রান্নাঘরে গেলেন। উপমন্যু টিভি চালালেন।

খবরের চ্যানেলে অরুণ কেস নিয়ে উত্তেজনা কমেছে। এখন কোথায় একটা বোম পড়েছে, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে।

লাহিড়ী এসে গেছিলেন। উপমন্যু উঠে দরজা খুলে লাহিড়ীকে ড্রইং রুমে বসালেন। লাহিড়ী বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হুট করে বেরিয়ে গেলেন?"

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। অনেকগুলো ব্যাপার দেখার ছিল। কিছু দ্বিধা ছিল, কেটেছে। চা খেয়ে নাও। আমরা হেমন্তের বাড়ি যাবো"।

লাহিড়ী বললেন, "হেমন্তই কি ব্যাপারটা করেছে বলে মনে হচ্ছে?"

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, "না না। আমি অন্য কাজে যাবো। হেমন্তের টাকা বের করার পুরো পদ্ধতিটা আমার জানা দরকার। না জানলে অনেক কিছু অজানা হয়ে থাকবে। কারা কারা ওর রিকভারি এজেন্ট, না জানলে কী করে হবে?"

লাহিড়ী বললেন, "তা ঠিক। ওর বাড়ি লেকটাউনে। ঠিকানা আমার কাছে আছে। চলুন তাহলে"।

উপমন্যু বললেন, "দাঁড়াও। চা না খেয়ে যাওয়া যাবে না"।

লাহিড়ী আর কিছু বললেন না। চা খেয়ে হেমন্তের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দুজনে।

হেমন্ত বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে তাদের দেখে প্রথমে আগের মতই সেকেন্ডের জন্য ঘাবড়ে গিয়ে পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

"এ গরীবখানায়? এত সকালে? কিছু হয়েছে কি? আসুন স্যার।"

উপমন্যু বললেন, "সেসব পরে হবে। আগে বল অরুণের রিকভারি এজেন্ট কারা ছিল?"

হেমন্ত বলল, "কেন স্যার? ওদের সন্দেহ করছেন? আমার ছেলেরা কিছুতেই এসব করবে না স্যার। আমাদের কাজ খুন করা না। লোন ডিফল্টারদের আমরা ভয় দেখাই শুধু"।

উপমন্যু বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললেন, "শুধু ভয় দেখাও? বাপরে, এটাও বিশ্বাস করতে হবে?"

হেমন্ত বলল, "ঠিক আছে স্যার, আমি এই ব্যাপারে কোন ঝামেলা করতে চাইছি না। সাধন ছিল। ওর সঙ্গে একটা ছোট খাটো ঝামেলা হয়েছিল। আমি আগে বলি নি। বলে রাখি। নইলে আমাকে ফালতু কেস দেবেন"।

উপমন্যু বললেন, "কোথায় সে?"

হেমন্ত বলল, "থাক না স্যার। কিছু হয় নি। অরুণবাবু পরের দিনই টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন তো। ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেছে"!

উপমন্যু বললেন, "ঠিক আছে। ওকে ফোন কর। নামটা সাধন বললে তো? আসতে বল"।

হেমন্ত বলল, “ও তো দিল্লি গেছে দিন পাঁচেক হল”।

উপমন্যু বললেন, “দিল্লি গেছে? যেদিন খুন হয়েছে সেদিন দিল্লি ছিল বলছ?”

হেমন্ত বলল, “হ্যাঁ। ছিল না স্যার”।

উপমন্যু বললেন, “বুঝলাম। তাহলে ঠিকানা দাও”।

হেমন্ত বলল, “বস্তিতে থাকে স্যার। আপনি খামোখা গিয়ে কী করবেন? আমি ফোন করে দিচ্ছি। ফিরলেই আপনার সঙ্গে দেখা করে নেবে”।

উপমন্যু বললেন, “আমি সর্বত্রগামী। দরকারে দিল্লিও চলে যাব। ঠিক আছে, তোমায় ঠিকানা দিতে হবে না, তুমি ওর বাড়ি নিয়ে চল”।

হেমন্ত বুঝল উপমন্যু কঠিন ঠাই। ব্যাজার মুখে বলল, “ঠিক আছে। আমি নিয়ে যাচ্ছি। চলুন”।

#

উল্টোডাঙার বস্তির মধ্যে দিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটছিল হেমন্ত। কোনমতে বলল, “স্যার, কোন দরকার ছিল না। ও তো আসতোই একদিন”।

উপমন্যু বললেন, “চুপ করে চল। কথা কম”।

হেমন্ত আর কিছু বলল না।

একটা ঘরের সামনে এসে হেমন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “এটাই স্যার। ওই দেখুন, দরজা বন্ধ”।

উপমন্যু দেখলেন দরজায় তালা দেওয়া। লাহিড়ীকে বললেন, “তালা ভাঙা ঠিক হবে?”

হেমন্ত প্রতিবাদ করে উঠল, “না না স্যার। ওসব কেন করতে যাবেন? এভাবে তালা ভাঙা ঠিক না। গরীব হলেও মানুষ তো বলুন”।

উপমন্যু দরজার কাছে গিয়ে তালাটা দেখলেন। পুরনো তালা।

হেমন্তকে বললেন, “সাধন পালিয়েছে, বা তোমার পরামর্শে গা ঢাকা দিয়েছে। তাই তো?”

হেমন্ত জোরে জোরে মাথা নাড়াল, “না স্যার। আমি অতো চালাকি করতে যাবো কেন?”

উপমন্যু বললেন, “কারণ তুমি জানো সাধনের সঙ্গে অরুণবাবুর একটা ঝামেলা হয়েছিল। সাধনকে না পেলে আমাদের তোমাকে আটক করতে হবে”।

হেমন্ত রেগে গেল, “কেন? লোকে কি বেড়াতেও যেতে পারবে না?”

উপমন্যু বললেন, “তুমি আমাদের সঙ্গে চল আপাতত। পরে দেখছি কী করা যায়”।

হেমন্ত তার ফোন বের করে ফোন করতে গেল।

উপমন্যু হেমন্তের ফোন কেড়ে নিয়ে বললেন, “চল। ফোন পরে করবে”।

হেমন্তের মুখ শুকিয়ে গেল।

লাহিড়ী উপমন্যুর কানে কানে বললেন, “স্যার হেমন্তকে আপনি আগের দিন তুই করে বলছিলেন”।

উপমন্যু মাছি মারার ভঙ্গি করে বললেন, “ছাড়ো তো। এদের আবার ডাক”!

২৯

।।পূর্ব কথা।।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে নদীর তীরে। পেছনের সিটে বসে অরুণ মদ খাচ্ছেন। ফোন বেজে যাচ্ছে তার। অনুষ্ঠান করতে এসেছেন টাকা নিয়ে। অনেকটা পথ আসার পর মনে হয়েছে মদ খাবেন। আজ আর গান গাইবেন না। অর্গানাইজাররা ফোন করে যাচ্ছে। অরুণ ফোন ধরছেন না।

ড্রাইভার দূরে ছিল। কোথাও গাইতে গেলে ড্রাইভার নিয়ে যেতেন তখন। এক সময় সে ছুটে এসে বলল, "স্যার, ম্যাডাম আমাকে ফোন করছেন"।

অরুণ বিরক্ত মুখে বললেন, "কী বলছে?"

ড্রাইভার তার ফোনটা এগিয়ে দিল।

অরুণ ফোন ধরে বললেন, "কী হয়েছে"?

ঋতুপর্ণা বললেন, "তুমি নাকি বাড়ি মর্টগেজ রাখছ?"

অরুণ বললেন, "তাতে তোমার কী?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমার কিছু না, কিন্তু তোমার একা মানুষের এত কী খরচা হয়?"

অরুণ খিচিয়ে উঠলেন, "সে কৈফয়ৎ কি এখন সোনাগাছির রাস্তায় শাড়ি তুলে দাঁড়িয়ে থাকা তোমাকে দিতে হবে?"

ঋতুপর্ণা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তুমি যদি ভেবে থাকো এসব শুনে আমি রেগে গিয়ে ফোন কেটে দেবো, তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছো। শোন, ও বাড়ি আমি মর্টগেজ দিতে দেবো না"।

অরুণ বললেন, "আর আমি কি না খেয়ে মরে যাবো? আমার দেনা কে শোধ করবে?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমি দিয়ে দেবো। ভেবো না"।

অরুণ বললেন, "তোর থেকে কেন নেবো? তোর টাকায় আমি মুতি। তুই কী ভাবিস, তোর টাকা নিয়ে আমি ভাবি?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমি ওই বাড়ি নিয়ে ভাবি। তোমার বাবা অনেক কষ্ট করে বাড়িটা করেছিলেন। ওটা প্লিজ হাতছাড়া কোর না"।

অরুণ বললেন, "বলছি তো, আমি কী করবো না করবো তোমার থেকে কিছু শোনার প্রয়োজন নেই। তুমি ফোন রাখো"।

ড্রাইভার উত্তেজিত হয়ে এসে বলল, "স্যার, একটা গাড়ি আসছে। অনেক ছেলে পিলে। আমি টেনে দেবো? মনে হচ্ছে ওই প্রোগ্রামে যান নি, ওরা খবর পেয়ে আসছে"।

অরুণ বললেন, "ঠিক আছে। চল। এই নাও, তোমার ফোন নাও"।

ড্রাইভার গাড়িতে উঠে গাড়ি ছোটাল। পেছনের গাড়িটা অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারলো না।

কলকাতা ঢুকে গেলে ড্রাইভার বলল, "স্যার ওরা তো আপনার বাড়ি চেনে"।

অরুণ বললেন, "ঠিক আছে বাড়ি যেতে হবে না। সঙ্গীতার বাড়ি চল"।

ড্রাইভার তাই করল।

সঙ্গীতা বাড়িতেই ছিলেন। শুট ছিল না। অরুণকে দেখে খুশি হলেন, "এসো"।

অরুণ মদের ঘোরে কী করবেন বুঝতে না পেরে সঙ্গীতার ঘরে ঢুকে সোফাতেই বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। সঙ্গীতা তার পাশে ঘুমোচ্ছেন। অরুণ ঘুম থেকে উঠে সঙ্গীতাকে ডেকে

বললেন, "ড্রাইভার ছেলেটা চলে গেছে?"

সঙ্গীতা বললেন, "হ্যাঁ। কাল তুমি ড্রাইভ করে চলে যেও। বেচারিকে আটকে রাখার দরকার নেই"।

অরুণ বললেন, "তা ঠিক। এই ঋতু আমার মাথা খারাপ করে দেবে"।

সঙ্গীতা খুব একচোট হেসে নিয়ে বললেন, "কেন? বাড়ি বন্ধক রেখেছ খবর পেয়ে গেছে বুঝি"?

অরুণ অবাক হয়ে বললেন, "হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে?"

সঙ্গীতা বললেন, "তোমার পেছনে লোক লাগিয়েছে তো। তুমি কোথায় যাও, কী কর, সব খবর নেয়। তোমাকে খুব ভালবাসে এখন"।

অরুণ রেগে গেলেন, "মানে? আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে? এত সাহস?"

সঙ্গীতা বললেন, "তা তোমার বউয়ের সাহস বরাবরই বেশি। নইলে আমার প্রোজেক্টে কাঠি করে কখনো? যাক গে, ওসব নিয়ে ভেবো না। বন্ধক না রাখতে চাইলে আমি একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। সে টাকা ধার দেয়। ইন্টারেস্ট বেশি লাগে"।

অরুণ হাত দিয়ে কথাটা ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমি যে ফ্যামিলির ছেলে, আমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হয় না। ঠিক আছে, যদি মর্টগেজ ছাড়া লোন দেয়, তাহলে কথা বলে দেখতে হবে"।

সঙ্গীতা বললেন, "কথা বলছি। ভেবো না। ও ভাল ছেলে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে"।

অরুণ ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, "শালা নিজে একটা রাস্তার মেয়ে হয়ে গেল, আর আমার উপর নাকি নজর রাখতে হয়। লজ্জাজনক ব্যাপার। তুমি অনমিত্রকে চেনো? ঋতু আমার রয়ালটি অবধি ওকে দিয়ে আটকে রেখেছে। তুমিই বল, আমার টাকায় আমি খাবো না কী করবো, সেটা ও কেন ঠিক করবে? এবার আমার টাকা আমি পাচ্ছি না, এরপরে আমি কী করব যদি আমি আমার রয়্যালটির টাকাটাও না পাই? খাবো কী?"

সঙ্গীতা বললেন, "সামনা সামনি বসে ঠিক করবে? ঋতুর সঙ্গে কথা বল। বসে মেটাও"।

অরুণ বললেন, "তাই করবো। পেছন থেকে ছুরি মারা ওর আমি বের করছি। অসভ্য বেহায়া মেয়েছেলে"!

সঙ্গীতা বললেন, "কালকেই বস। সকালে উঠে ফোন কর"।

অরুণ বললেন, "সকালে না। এখনই করছি"।

সঙ্গীতা আটকালেন, "না। মাথা ঠাণ্ডা কর। আমি সকালে মনে করিয়ে দেবো। ঘুমাও"।

অরুণ চুপ করে শুয়ে পড়লেন। মিনিট খানেকের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়লেন।

সঙ্গীতা ঘুমালেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

৩০

।।বর্তমান সময়।।

"আমাকে অকারণ আটকে রাখছেন স্যার। আমি কিছু জানলে তো বলবো। ব্যবসার দিনটা ফালতু নষ্ট করে দিচ্ছেন"।

হেমন্তের কথাটা আমল দিলেন না উপমন্যু। বললেন, "সাধনের চোদ্দগুষ্টির হিসেব লাগবে আমার। যত তাড়াতাড়ি পাবো, তত তাড়াতাড়ি ছাড়বো"।

হেমন্ত বলল, "স্যার সাধন মারে নি। মারলে আমি আপনাকে বলে দিতাম। সাধনের অরুণবাবুর উপর রাগ হয়েছিল সত্যি। ওর বাবা অরুণবাবুর গান শুনতেন। সাধন ওঁকে আলাদা সম্মান করতো। আমাকে বলতে এসেছিল যে অরুণবাবুর রিকভারিটা ও করবে না। ওর জায়গায় যেন অন্য কাউকে দিই। আমিই ওকে জোরে পাঠাই। অরুণবাবু ওকে কুকুর বলে দেয়। সেটা শোনার পর থেকে রেগে ছিল। দিল্লিতে ওর মাসীর বাড়ি। মাসীর মেয়ের বিয়ে। ওর অনেক আগে থেকেই আমাকে বলা ছিল"।

উপমন্যু বললেন, "মাসীর বাড়ির ঠিকানাটা লাগবে তাহলে"।

হেমন্ত অসহায় গলায় বলল, "আমার কাছে কী করে থাকবে?"

উপমন্যু বললেন, "সাধন কী ধরণের কাজ করে? গায়ে হাত তোলে?"

হেমন্ত মাথা নাড়ল, "না না। ওকে গলাবাজি করতে পাঠানো হয়। ওইসব ও পারে না বলেই তো আমার ঝামেলা ছিল"।

উপমন্যু বললেন, "ঠিক আছে। আপাতত আমাদের মেহেমানদারিতে থাকো। তোমাকে ছাড়া যাবে না। পরে আমি ভেবে দেখবো"।

হেমন্ত কাতর কণ্ঠে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। উপমন্যু তাতে আমল না দিয়ে বাইরে বেরোলেন।

অম্বরকে ফোন করলেন। অম্বর প্রথমবারে ধরল না। দ্বিতীয়বার রিং হবার পর ধরল, "হ্যাঁ স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "কোথায় তুমি?"

অম্বর বলল, "বালিগঞ্জে আছি স্যার। ফ্যামিলির কাজ আছে"।

উপমন্যু বললেন, "আমার অফিসে চলে এসো। আধ ঘণ্টা সময় আছে"।

অম্বর বলল, "পরে আসি স্যার? কাজ সেরে?"

উপমন্যু বললেন, "এখনই। এসো"।

অম্বর ঘাবড়ে গেল, "সিরিয়াস কিছু?"

উপমন্যু বললেন, "এসো বলছি"।

ফোন কেটে দিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন। লাহিড়ী বললেন, "হেমন্তকে বেশিক্ষণ আটকানো যাবে না স্যার। সেরকম কোন অভিযোগ নেই ওর বিরুদ্ধে, উল্টে সমস্যায় পড়ে যাবো আমরা"।

উপমন্যু বললেন, "জানি। ওকে আধঘণ্টা পরে ছেড়ে দিও। পরে আবার ধরা যাবে দরকার হলে"।

লাহিড়ী বললেন, "আধঘণ্টা পরে কেন?"

উপমন্যু বললেন, "আরও কিছু বলতে চাইলে বলে যাক। ছেড়ে দিলে আর বলবে না। এখানে যতটা চাপে থাকবে, বাইরে গিয়ে সে চাপ রিলিজ হয়ে যাবে। তবে ও হার্ড নাট। নিজেও জানে আমাদের হাত পা বাঁধা। দেখা যাক, যদি কোন লাভ হয়"।

লাহিড়ী হাসলেন, "ঠিক আছে। চা বলব?"

উপমন্যু বললেন, “বল”।

অম্বর ঠিক আধঘণ্টার মধ্যেই চলে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, “স্যার পুরো ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। কী হয়েছে বলুন প্লিজ”।

উপমন্যু বললেন, “বস। তাড়া নেই। চা খাবে?”

অম্বর বলল, “খেতে পারি”।

উপমন্যু বললেন, “বস”।

অম্বর বসল। উপমন্যু বললেন, “অরুণের বাড়িতে যে হানা হয়েছিল রিকভারি এজেন্টের, সেটা আমাকে বল নি কেন?”

অম্বর ঘাবড়াল না। স্বাভাবিক গলায় বলল, “আমি ভেবেছি আপনি জানেন স্যার। এটা তো বিরাট কিছু ব্যাপার না। হেমন্তর কাছে টাকা নিয়েছিল আপনি জানেন তো”!

উপমন্যু বললেন, “আমি নতুন লোক না অম্বর। আমার সঙ্গে এসব করে পার পাবে কি?”

অম্বর বলল, “সত্যি স্যার। আমি বুঝি নি এটা আপনি জানেন না”।

উপমন্যু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “বেশ। তাহলে দেখছি আমি কী করতে পারি। সেটা জানলেই মনে হয় আপাতত কাজ হয়ে যাবে। দেখছি কী করা যায়”।

অম্বর এবার মচকাল, “স্যার স্যার। শুনুন। রেগে যাচ্ছেন কেন? সেদিন ভিডিও করেছিলাম স্যার। পাঠাচ্ছি”।

উপমন্যু বললেন, “বলছিলে না কেন? কীসে আটকাচ্ছিল? ঋতুপর্ণা বারণ করেছিলেন?”

অম্বর মাথা নিচু করল।

উপমন্যু বললেন, “কেন বারণ করেছিলেন?”

অম্বর বলল, “জানি না স্যার। সেদিনই বলেছিল ভিডিওটা যেন কোথাও না ছড়ায়। ভাবলাম আপনাকেও দেওয়া যাবে না”।

উপমন্যু বললেন, “খুনের পরে বলেছিল না খুনের আগে?”

অম্বর বলল, “আগে স্যার”।

উপমন্যু বললেন, “তোমার কী মনে হয়? কারণটা কী?”

অম্বর বলল, “ফ্যামিলি প্রেস্টিজ বা ম্যাডামের প্রেস্টিজ হবে। ভয় পাচ্ছেন হয়তো মিডিয়াতে যাবে”।

উপমন্যু বললেন, “তুমি খুব ভাল করে জানো আমাকে দিলে মিডিয়াতে যাবে না। জানো না?”

অম্বর বলল, “হ্যাঁ স্যার জানি”।

উপমন্যু বললেন, “তবে?”

অম্বর বলল, “প্রফেশনাল এথিকস স্যার। আর কোন কারণ নেই”।

উপমন্যু বললেন, “হু। বুঝলাম। পাঠাও ভিডিওটা”।

৩১

.।।পূর্ব কথা।।

"অরুণবাবু বলছেন"?

"বলুন"।

"স্যার, আপনাকে একটা খবর জানানোর জন্য ফোন করছিলাম"।

"কী বলুন তো?"

"আগামী একত্রিশে মার্চ আপনার যে প্রোগ্রামটা ছিল রবীন্দ্রভবনে, সেটা ক্যান্সেল করা হয়েছে"।

"মানে? প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে"?

"না না, স্যার আমি পরে আপনাকে ফোন করে জানাচ্ছি ডিটেলসে। এখন সবটা বলা যাবে না"।

ফোনটা কেটে গেল। অরুণ গুম হয়ে বসে রইলেন। রবীন্দ্র ভবনের অনুষ্ঠানের জন্য তাকে বুক করা হল, চুঁচুড়ার প্রোগ্রামে গেলেন না পর্যন্ত, সেটা ক্যান্সেল করে দিল? রাগ হচ্ছে কেমন একটা। অসহ্য, তীব্র রাগ, অথচ কী করবেন বুঝতে পারছেন না। এরকমই হয়। সব খানে এরকম হয়। ওরা ভাবছে এভাবে তাকে দমিয়ে রেখে দেবে, এত সস্তা সেটা? এত সহজে তাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলা যায়?

বেশ সেজেগুজে বেরোচ্ছেন ঋতুপর্ণা। অরুণ ড্রইং রুমের সোফায় বসে ছিলেন। ঋতুপর্ণাকে বেরোতে দেখে বললেন, "কোথায় যাচ্ছো?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "রথীনদার ওখানে। তোমাকে বললাম না কাল রাতে? কেমন লাগছে আমাকে?"

অরুণ ঋতুপর্ণাকে আগাপাস্তালা দেখে বললেন, "বগল দেখা যাচ্ছে তোমার। বগল দেখাতে ভাল লাগে লোককে?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "মানে বগল কোথায় দেখালাম? ওরকম দেখানো যায় নাকি?"

অরুণ বললেন, "নিজে বোঝো না কী দেখা যাচ্ছে? কোথাও যেতে হবে না তোমায়। ঘরে যাও। সব বন্ধ"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "মানেটা কী? আমি যাবো তোমাকে বলেছিলাম। আর তোমাকে বলে যেতে হবে নাকি? সেসব কবে থেকে হল?"

অরুণ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আমার বাড়িতে থাকলে তো আমাকে বলেই যেতে হবে। আমাকে না বলে যাবে নাকি"?

ঋতুপর্ণা বললেন, "তোমার বাড়িতে থাকি মানে তুমি আমার গলার উপর পা তুলে নাচবে? আমি কি তোমার ক্রীতদাসী? আমাকে তুমি কী মনে কর বল তো? বাঁদর কিনে এনেছ বাঁদর নাচ নাচাবে বলে?"

অরুণ চিৎকার করতে শুরু করলেন, "যা মনে করি, বেশ মনে করি। তুই বাইরে গিয়ে পরপুরুষের সামনে স্লিভলেস পরে নাচবি আমি সেটা বসে বসে দেখবো?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "আমি নাচতে যাচ্ছি কে বলেছে তোমায়? এত ডিমিন করে কথা বলছ কেন? কী হয়েছে তোমার আমাকে বলবে? কোন সমস্যা হয়েছে?"

অরুণ ঘামছিলেন। দাপাতে দাপাতে বললেন, "কোথাও যাবি না তুই। ঘরে যা। চল"।

অরুণ ঋতুপর্ণাকে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে শুরু করলেন। ঋতুপর্ণা বললেন, "একী? আমায় ছাড়ো! এরকম করছো কেন? প্লিজ শোন, তোমার কোন সমস্যা হচ্ছে। তোমাকে আমি চিনতে পারছি না যে? তুমি এরকম ছিলে না অরুণ। আমার কথা শোন। এটা একটা রোগ। চিকিৎসা করা উচিত"।

অরুণ বললেন, “রোগ? আমাকে পাগল বলছিস তুই? আমি পাগল? তুই জানিস আমি কত বড় একজন মানুষ? কত লোক আমাকে সম্মান করে? তোর এত বড় সাহস হয় কী করে আমাকে এসব বলার?”

ঋতুপর্ণা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, অরুণ ঋতুপর্ণাকে ঘরের ভেতর ঠেলে ফেলে দিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। ঋতুপর্ণা দরজা ধাক্কালেন, অরুণ তাও দরজা খুললেন না। দাপাতে দাপাতে পায়চারি করতে করতে বললেন, “মুখার্জি বাড়ির বউ, সে নাকি স্লিভলেস পরে বাইরের লোককে বগল দেখাতে যাবে। সাহস কত! এত সাহস, আমি গলা টিপে মেরে দেবো তোকে, এ বাড়ি থেকে তোর লাশ বেরোবে শুধু বুঝেছিস? কত বড় সাহস! কত বড়”।

অরুণের ফোন বাজতে শুরু করেছে। অরুণ গিয়ে ফোন ধরলেন, “হ্যালো”।

“দাদা, একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। আপনার প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয় নি। পোষ্টপন হয়েছে। দাদা বললেন পরের দিন কি আপনার সময় হবে? সাতটায় প্রোগ্রামটা রিশিডিউল করা হয়েছে। সিরিয়ালের অ্যাকটরদের একটা প্রোগ্রাম আছে সে দিন বলেই এই সমস্যাটা হয়েছে”।

অরুণ বললেন, “কেন রে? আমাকে কি ফ্যালনা মনে হত? সিরিয়াল? ঐ যাত্রার লোকেদের এত সম্মান? মুখে মুতি তোদের শুয়োরের বাচ্চা”।

ফোন কেটে দিলেন তিনি।

৩২

।।পূর্ব কথা।।

"আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। ইনফ্যাক্ট ওই কঠিন সময়ে আপনি যেভাবে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে সারভাইভ করাতে লিড করেছিলেন, তা প্রশংসনীয়"।

পার্টিতে অনমিত্র একটা স্কচ নিয়ে কোণায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তমালতরু অনমিত্রকে দেখে এগিয়ে গিয়ে কথাগুলো বললেন।

অনমিত্র ভদ্রতার হাসি হাসলেন, "ধন্যবাদ। আপনার কাজ আমি রিসেন্টলি দেখেছি। বেশ ভাল প্রোগ্রেস হচ্ছে। ভেরি গুড"।

তমালতরু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমার চ্যালেঞ্জটা তো বুঝতে পারছেন। ছোট ইন্ডাস্ট্রি, কম পুঁজি, সবকিছুই বড় সমস্যা সংকুল"।

অনমিত্র বললেন, "তা তো বটেই। এই লিমিটেশনের মধ্যেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সেটা খুব বড় কথা। কিপ ইট আপ"।

পার্টিতে অরুণ প্রবেশ করলেন। তমালতরু অরুণকে দেখা মাত্র ফিসফিস বললেন, "এ এখানে কী করছে?"

অনমিত্র সেটা শুনতে পেয়েছিলেন। হেসে বললেন, "অরুণবাবুর সঙ্গে আপনার কোন সমস্যা আছে নাকি"?

তমালতরু বললেন, "কী যে বলি? ওর সঙ্গে আপনার কোম্পানির এত বছরের সম্পর্ক। আমার কিছু বলা ঠিক হবে না হয়ত"।

অরুণ সরাসরি ড্রিংক্স কাউন্টারে চলে গেছেন। গ্লাস নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করেছেন। অনমিত্র বললেন, "দেখুন, সেটা প্রফেশনাল ফিল্ড। অরুণ মুখার্জির মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে আর কিছু দেওয়া আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে আমি বিশ্বাস করি আপনার অনেক কিছু দেওয়ার আছে"।

তমালতরু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ। উনি দিতে পারার ক্ষমতাটা নিজেই নষ্ট করে ফেলেছেন। ঋতুকে কি কম জ্বালাতন করেছিলেন? নেহাত ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সহনশীল এবং অরুণকে ভালবাসতেন বলে ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য কোন মেয়ে হলে অরুণের কপালে দুঃখ ছিল"।

অরুণের চোখ অনমিত্রর দিকে পড়ল। তমালতরুর সঙ্গে কথা অনমিত্র কথা বলছেন দেখে অরুণ হাতছানি দিয়ে অনমিত্রকে ডাকলেন। তমালতরু বললেন, দেখেছেন কী অসভ্য? আপনাকে এমনভাবে ডাকছে যেন কোন ওয়েটারকে ডাকছে"।

অনমিত্র গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলেন, "দেখে আসি। এখানে আর সিন ক্রিয়েট করতে চাই না"।

তমালতরু বললেন, "তা ঠিক, যান"।

অনমিত্র এগিয়ে গেলেন অরুণের দিকে। বললেন, "এখানে?"

অরুণ বললেন, "হ্যাঁ, আমি ইনভাইটি। ফ্রিতে মদ খেতে আসিনি রে ভাই। তুমি ওই স্কাউন্ড্রেলটার সঙ্গে কী কথা বলছিলে?"

অনমিত্র চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে এত উঁচু গলায় কথা বোল না। মিডিয়াও আছে"।

অরুণ ফুঁসতে ফুঁসতে মদ গিলতে গিলতে বললেন, "আমার পাশে বোস। কথা আছে"।

অনমিত্র বসলেন।

অরুণ বললেন, “এখানে একটা ভাল স্কুলে একটা বাচ্চার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?”

অনমিত্র অবাক হয়ে বললেন, “কেন”?

অরুণ বললেন, “লাগবে। অঙ্গীরার বাচ্চা। ওকে আগের স্কুল থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে। বরটা একটা বাস্টার্ড। এখন একটা স্কুলে বাচ্চাটার ব্যবস্থা করতে হবে”।

অনমিত্র বললেন, “আপনি রুদ্রদাকে চেনেন তো। আপনি বললেই হবে”।

অরুণ ভ্রূ কুঁচকে অনমিত্রর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “রুদ্র না? ঠিক বলেছ তো, আমার মাথাতেই ছিল না। রাইট। আমি আজকেই ফোন করবো”।

অনমিত্র বললেন, “কিন্তু এই অঙ্গীরা কে?”

অরুণ বললেন, “আমার বন্ধু। বন্ধু থাকতে পারে তো আমার?”

অনমিত্র বললেন, “তা থাকতে পারে, তবে আপনি যেভাবে বন্ধু সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন, তাতে আপনার সমস্যা বাড়বে এটা আমি বুঝতে পারছি। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ভালবাসি, অনেকবছর দেখছি, একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই বললাম কথাটা”।

অরুণ রেগে গিয়ে বললেন, “ওই ডিরেক্টরটা আমার নামে তোমার কান ভাঙাচ্ছিল, তাই না?”

অনমিত্র মাথা নাড়লেন, “কান ভাঙাতে হবে কেন? আমি কি কিছু জানি না? দেখতে পাচ্ছি না”?

অরুণ বললেন, “আমিও সব জানি, আমিও সব বুঝি। তোমাকে ঋতু আমার নামে আজে বাজে বলে যায়। আমার প্রাপ্য থেকে পর্যন্ত তুমি আমাকে বঞ্চিত করতে শুরু করেছো”।

সবাই তাদের দিকে তাকাচ্ছে। অনমিত্র উঠে পড়ে বললেন, “আমি এখন আসছি। পরে কথা বলব আমরা”।

অরুণও উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করতে শুরু করেছেন, “বুঝি, আমি সব বুঝতে পারি। কে আমার নামে কোথায় কী বলে বেড়াচ্ছে। ভেবেছে আমি কিছুই বুঝি না। ধুস শালা”...

কাঁচের গ্লাসটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে পার্টি থেকে রাগের মাথায় বেরিয়ে গেলেন অরুণ।

৩৩

।।পূর্ব কথা।।

“ওয়াইজ ডিসিশন নিয়েছ তুমি। ইন্ডাস্ট্রিতে এসে সবার আগে পুরনো বরকে পুরনো খোলসের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। তার উপর তোমার বর অত্যাচারী। জ্বালাতন করত। ঠিক করেছো যা করেছো”।

পার্টিটা জমে উঠেছে। ঋতুপর্ণা বসে ছিলেন। না জানতে চাইলেও তার মতামত দিতে চলে এসেছেন রুমানা। তিনি উত্তর দিলেন না। সঙ্গীতা দূরে বসে আছেন।

ইচ্ছে না থাকলেও পার্টিটায় থাকতে হবে। সবটাই কন্ট্যাক্ট তৈরির চেষ্টা। যত মানুষের সঙ্গে পরিচিতি বাড়বে, তত বেশি সুযোগ আসবে। কাজের খোঁজ সবাই করে যাচ্ছে। কাজ না থাকলে, একবার স্ক্রিন থেকে হারিয়ে গেলে আর কাজ পাওয়া যায় না। প্রথম সারির সবারই এই অবস্থা, তিনি তো সবে শুরু করেছেন। যে বাড়িটায় থাকছেন এখন, ভাড়া অনেকটা বেশি। সে বাড়ি ছাড়তে হলে আবার মাথা নিচু করে শেষের কবিতায় ফিরে যেতে হবে তাকে। ব্যাপারটা তার জন্য মোটেও ভাল হবে না। রাতে আজকাল ঠিক করে ঘুম হয় না। অরুণকে ছাড়ার পর থেকে অনেকরকম প্রলোভন আসছে। যাদের কাছ থেকে কোন দিন এরকম কিছু প্রস্তাব আসতে পারে ভাবতে পারেন নি, তারাও প্রস্তাব করছে।

রুমানা আবার বলতে শুরু করলেন, “অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি বেশি কিছু কথা বলতে চাই না আসলে, তাও কথাগুলো তুমি বলেই বললাম, কিছু মনে নিও না। তোমার বরকে কিন্তু আজকাল অনেকেই সঙ্গীতার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “বেশ তো। সেটা ওর ব্যাপার। ওটা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবো কেন?”

রুমানা বললেন, “না মানে তোর জানা উচিত এগুলো। আফটার অল কাক কাকের মাংস খায় না। সঙ্গীতা তো খেলো”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “সে খাক। আমি আর কী করবো? তবে আমার সংসার সঙ্গীতা ভাঙে নি। আমি নিজে বেরিয়ে এসেছি, তাই এখানে সঙ্গীতার কোন দোষ নেই”।

রুমানা আরও খানিকক্ষণ গাইগুই করে উঠে পড়লেন।

রুমানা যেতেই হঠাৎ অজয় দাস চলে এলেন, “ম্যাডাম, আপনি একবারে মুষড়ে পড়েছেন দেখছি। সব ঠিক আছে তো?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “হ্যাঁ। ঠিক আছি। মুষড়ে পড়ি নি তো”।

অজয় বললেন, “বসতে পারি?”

ঋতুপর্ণা বললেন, “শিওর। বসুন”।

অজয় বসে বললেন, “আপনার প্রথম কাজটা হিট হয়েছে বটে, তবে তার জন্য কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে একটা ট্রিট পাবো”।

ঋতুপর্ণা বললেন, “কেন বলুন তো?”

অজয় বললেন, “ওই দেখুন, যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর। আপনার ইন্টারভিউটা কতবার চলেছিল বলুন তো সিনেমাটা রিলিজের আগে? আমি না বললে সেটা হত?”

অজয় দাসের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিচ্ছিরি স্যাঁতস্যাঁতে ব্যাপার আছে। যেন লোকটাই একটা শ্যাওলা। অনেক দিন ধরে বৃষ্টি হয়ে পাথরের মধ্যে যে পুরু শ্যাওলা জমে, সেই শ্যাওলা।

ঋতুপর্ণার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু ওঠা যাবে না। এ লোকটা যে মুহূর্তে বুঝবে সে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, সরাসরি ক্ষতি করার চেষ্টা করতে শুরু করে দেবে। মিডিয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না। বরং ভয় পেতে হয়। সে হাসল, "সেটা আপনি ঠিক বলেছেন। আপনার ইনিশিয়েটিভটা না থাকলে কিছু হত না। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ"।

অজয় বললেন, "ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। অরুণবাবুর খবর রাখেন এখন?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "না। রাখি না। জিভ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করে অজয় বললেন, "রিয়াল ট্যালেন্ট ছিল বুঝলেন। কত প্রোগ্রাম দেখেছি। নিজের হাতে সব শেষ করে দিলেন। মদই খেলো অ্যাকচুয়ালি"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "হবে হয়ত"।

অজয় বললেন, "হয়ত কেন? ঘটনা। এটাই ফ্যাক্ট। আপনাকে..."

ঋতুপর্ণা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাকে বেরোতে হবে। পরে কথা বলব"।

অজয় হকচকিয়ে গেলেন। ঋতুপর্ণা দাঁড়ালেন না। বেরিয়ে গেলেন পার্টি ছেড়ে। রাতের দিকে অজয়ের মেসেজ এল তার কাছে, "কথা বলে ভাল লাগল। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এ শহরে হবে না। দুবাইয়ে আমার পরিচিতর হোটেল আছে। সারারাত আমরা কথা বলতে পারি না"?

৩৪

।।বর্তমান সময়।।

নোটপ্যাডে লিখছিলেন উপমন্যু। লাহিড়ী চুপ করে বসে আছেন তার সামনে। উপমন্যু লিখতে লিখতেই বললেন, "মনে প্রশ্ন আসছে"?

লাহিড়ী বললেন, "ঋতুপর্ণা মুখার্জির ব্যাপারে যেখানে যেখানে যা যা কথা উঠে এল, তাতে দেখা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা সব সময় অরুণের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে গেছেন। সমস্যা হল, উনি মারাত্মক অ্যামাউন্টের খোরপোষও নিয়েছিলেন অরুণের থেকে। সে ব্যাপারটা কন্ট্রাডিক্ট করছে স্যার"।

উপমন্যু বললেন, "কত টাকা নিয়েছিলেন?"

লাহিড়ী বললেন, "কুড়ি লাখ এককালীন। এর সঙ্গে রয়্যালটির টাকারও অনেকটা অংশ। শাসালো উকিল পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। তুলনায় অরুণের উকিল কমজোরি ছিল। ফলে কেসটা জিতে গেছিলেন। অরুণের হ্যাভক ডাউনফল কিন্তু ওই কেস হারার পরেই শুরু হয়"।

উপমন্যু বললেন, "হু। হতে পারে ভদ্রমহিলা তখন অত রোজগার করতেন না বলে কেসে জিততে অসুবিধে হয় নি। হতে পারে পরে অরুণকে অনেকটা টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নাও হতে পারে। সাধনের খবর কী?"

লাহিড়ী বললেন, "খোঁজ চলছে"।

বসাক ডেকে পাঠিয়েছেন। উপমন্যু বললেন, "তুমি বস। আমি আসছি"।

লাহিড়ী ঘাড় নাড়লেন, "ওকে স্যার"।

বসাকের চেম্বারে বসাক একাই ছিলেন। উপমন্যু অনুমতি নিয়ে চেম্বারে ঢুকে বসলেন। বসাক বললেন, "হেমন্তের ব্যাপারে ফোন আসছিল বোস"।

উপমন্যু হাসলেন, "স্যার এটা তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। মাথায় বড় হাত না থাকলে এত বড় ব্যবসা ফাঁদা কি ওর পক্ষে সম্ভব হত?"

বসাক বললেন, "কিন্তু স্ট্রং কিছু নেই ওর এগেইন্সটে। ফালতু ঝামেলার কী দরকার?"

উপমন্যু বললেন, "ছেড়ে দিয়েছি তো। আটকে রাখি নি। ও সাধনের ব্যাপারে আগে কিছু বলে নি। এটা আমাদের তদন্তে বিপথে চালিত করার মধ্যে পড়ে"।

বসাক মাথা নাড়লেন, "তা ঠিক। তবু নজর রেখো। হাই প্রোফাইল কেস বলেই তোমার কাজটা অনেক বেশি কঠিন"।

উপমন্যু বললেন, "চিন্তা করবেন না স্যার, তেমন প্রমাণ পেলে প্রোফাইল দেখবো না"।

বসাক হাসলেন, "তা ঠিক। কেসের প্রগ্রেস কতটা?"

উপমন্যু বললেন, "সাধন ধরা পড়ুক। আরও কয়েকটা মিসিং লিংক খুঁজছি। সেগুলো পাই। তারপর দেখা যাক"।

বসাক বললেন, "তোমার কি কোন সমস্যা হচ্ছে?"

উপমন্যু বললেন, "না। হচ্ছে না। তবে মিসিং লিংকগুলো খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা দরকার। অরুণ ভীষণ মেল শভিনিস্ট টাইপ লোক ছিলেন। ঋতুপর্ণাকে তিনি বার বার আটকে গেছেন। শেষ অবধি থাকতে না পেরে ঋতুপর্ণা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলেন। এদিকে অরুণের সঙ্গে যে দুটি মেয়ের যোগাযোগ ছিল, তারা অরুণের থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন। অরুণ তাদের মসীহা ছিল বলতে পারেন। আর ছিলেন

সঙ্গীতা, যিনি হেমন্তের সঙ্গে অরুণের যোগাযোগ করিয়েছিলেন। সঙ্গীতার সঙ্গেও অরুণের সম্পর্ক মন্দ ছিল না, যদিও ঋতুপর্ণা অরুণের মৃত্যুর জন্য হেমন্তকে সরাসরি দায়ী করেছিলেন। প্রফেশনাল রাইভালরি অরুণের তেমন ছিল না বললেই চলে। অরুণকে এখন কেউ ডাকে না। তেমন লাইভ প্রোগ্রাম পান নি। ওকে কেউ সরাবে বলে এখন অবধি কিছু পাওয়া যায় নি। আর রইল বাকি সাধন"।

বসাক বললেন, "হু। সে ব্যাটার টিকি পাওয়াটা এখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি"।

উপমন্যু বললেন, "খোঁজ চলছে। দেখা যাক"।

বসাক বললেন, "চ্যানেলগুলো অলরেডি প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। এখনও কোন খুনী ধরা পড়ল না কেন? মজার ব্যাপার হল, ওরা নিজেরাও তদন্ত করে কিছু বের করতে পারে নি। ঋতুপর্ণার কেচ্ছা ঘাঁটা ছাড়া আর নতুন কিছু বেরোলে তাও বোঝা যেত"।

উপমন্যু বললেন, "চ্যানেল নিয়ে ভাবছি না। খুনের প্যাটার্নটা নিয়ে ভাবছি। প্রফেশনাল হাত আছে কোন সন্দেহ নেই। খুনি সামনের দরজা দিয়ে এসে খুন করে পেছনের প্রাচীর টপকে পালিয়েছিল। সে এ বাড়ি ভাল করে চিনতো। হয় রেইকি করে গেছে, নয় রেগুলার যাওয়া আসা ছিল"।

বসাক বললেন, "এবং সে পুরুষ?"

উপমন্যু বললেন, "সেরকম কোন ব্যাপার নয়। সে যদি ফিট হয়, তাহলে প্রাচীর টপকাতেই পারে। আমার আর আটচল্লিশ ঘণ্টা দিন স্যার"।

বসাক বললেন, "শিওর। গো অ্যাহেড"।

উপমন্যু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"।

৩৫

“কেমন লাগছে তোমার চাকরি?”

রাত সাড়ে দশটা। চেম্বারে বসে আছেন দুজনে।

সিগারেট টানতে টানতে লাহিড়ীর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন উপমন্যু।

লাহিড়ী বললেন, “ইন্টারেস্টিং স্যার”।

উপমন্যু মুখ কুঁচকালেন, “আহা সত্যি কথাটা বল। এত কাদা ঘাঁটতে হবে ধারণা ছিল?”

লাহিড়ী বললেন, “ধারণা ছিল কাদা ঘাঁটতে হবে। সেটা যে এতটা হবে, সেটা বুঝতে পারি নি স্যার”।

উপমন্যু বললেন, “ঠিক। আমারও ধারণা ছিল না। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। তারপর মনে হয়, এই কাদাই আমার পেটের ভাত জুগিয়েছে এতদিন। ঘাঁটতে হলে হবে। কী আর করা যাবে?”

লাহিড়ী বললেন, “স্যার, এখন আমরা কী করতে পারি? আজ এখনো এখানে বসে আছি কেন?”

উপমন্যু বললেন, “আমাদের কাজে খোঁচর থাকে, জানো তো? ইনফরমার কয় যাহারে”।

লাহিড়ী মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ স্যার, কেন জানবো না?”

উপমন্যু বললেন, “সাধনের পাড়ায় এমন এক পিস খোঁচর আছে আমার। খবর দেবে। চুপ করে বসে আছি সে জন্যই”।

লাহিড়ী সোজা হয়ে বসলেন, “আপনার কি ধারণা সাধন...”

উপমন্যু বললেন, “ঘরেই আছে। কোথাও যায় নি”।

লাহিড়ী বললেন, “তাহলে তখন তালা ভাংলেন না কেন?”

উপমন্যু বললেন, “হেমন্তর অনেক উপর অবধি হাত আছে। ফালতু ঝামেলা করতে ইচ্ছে করে না আমার আর। যখন সময় হবে, ঠিক বেরিয়ে আসবে। একটু অপেক্ষা, ওই যা”।

লাহিড়ী আর কিছু বললেন না। সোয়া এগারোটা অবধি বসে থেকে উপমন্যু বললেন, “ফোন এলো না। ঠিক আছে। চল, এগোই”।

লাহিড়ী বললেন, “বাড়ি?”

উপমন্যু বললেন, “হ্যাঁ। পিঁপড়ে গর্তে ঢুকে আছে। খাবারের খোঁজে ঠিকই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা এখানে আর বসে কী করব...”

কথা শেষ হবার আগেই ফোন বেজে উঠল উপমন্যুর। সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে বললেন, “বল। দেখে নিয়েছো? ওকে...”

ফোন রেখে একগাল হেসে উপমন্যু বললেন, “ওই লোকাল থানায় খবর পাঠাও। পিঁপড়ে ধরতে যাবো, ওদের লাগবে। চল, ওদিকেই যাই”।

লাহিড়ী হকচকিয়ে বললেন, “পাওয়া গেছে?”

উপমন্যু বললেন, “পেছনের দরজা দিয়ে খাবার পৌঁছেছে। কতক্ষণ আর খিদে চেপে বসে থাকবে। খাবার তো যেতেই হত”।

লাহিড়ী বললেন, “এর মধ্যে পালিয়ে যেত যদি?”

উপমন্যু বললেন, “আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে যেত আর কী। তুমি ফোন কর”।

লাহিড়ী প্রয়োজনীয় ফোন সেরে নিলেন।

সাধনের ঘরের সামনে তারা যখন পৌঁছলেন, তখন রাত সাড়ে বারোটা। উপমন্যু সরাসরি ঘরের পেছন দিয়ে গিয়ে দরজায় নক করলেন। কোন সাড়া এল না। উপমন্যু এবার গলা ছাড়লেন, "সাধন, অকারণ লুকিয়ে থেকে লাভ নেই ভাই। হেমন্ত তোমায় বাঁচাতে পারবে না। তুমি দোষী হলে ধরা দাও, বেঁচে যাবে। আর নির্দোষ হলে আমি বলতে পারি, তোমাকে বের করার দায়িত্ব আমার। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। গায়ে হাত দেবার ব্যাপারটা তো ছেড়েই দিলাম"।

বস্তির লোক জমতে শুরু করেছে চারদিকে। কেউ কোন কথা বলছে না। শুধু ভিড় বাড়ছে একটু একটু করে।

আরো কয়েক মিনিটের অপেক্ষা। প্রায় তিন মিনিট পর দরজাটা খুলে সাধন বেরিয়ে এল। তার চোখ মুখ বসে গেছে, ভয়ে তার হাত পা রীতিমত কাঁপছে।

উপমন্যু হেসে বললেন, "হেমন্তর বুদ্ধিতে মরতে বসেছিলে হে"।

সাধন হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে উপমন্যুর পায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, "বিশ্বাস করুন স্যার, আমি খুন করি নি। আমি করি নি"।

উপমন্যু সাধনকে দু হাতে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, "তাহলে ওই এলাকায় সেদিন ওই সময় তুমি কী করতে গেছিলে?"

সাধন বলল, "চমকাতে গেছিলাম স্যার। ভয় দেখাতে গেছিলাম ওই ফালতু লোকটাকে। দরকার হলে দু চারটে চড় চাপড়ও মারতাম। দাদার টাকা দিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু লোকটা আমাকে গালাগাল দিয়েছিল। আমি ওকে বুঝে নিতাম। গিয়ে দেখলাম..."

উপমন্যু বললেন, "অলরেডি পড়ে আছে... তাই তো?"

সাধন দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হ্যাঁ স্যার। আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকেই ধরবে, দাদাকে ফোন করলাম। দাদা বলল গা ঢাকা দে। আমার কাছে টাকা নেই। আমি কোথায় যাবো? এখানেই ঘরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে..."

উপমন্যু বললেন, "সেটা সকালেই বুঝেছিলাম। তুমি ঘরে যাও। সামনের তালা খুলে দিও"।

সাধন চোখ বড় বড় করে উপমন্যুকে দেখে বলল, "নিয়ে যাবেন না?"

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, "না। পালাবে না শুধু"।

সাধন বলল, "না স্যার। পালাবো না"।

উপমন্যু আর কিছু বললেন না।

৩৬

"সাধন নির্দোষ স্যার?"

গাড়িতে উঠে স্টার্ট করেই জিজ্ঞেস করলেন লাহিড়ী।

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ, ৯০% নিশ্চিত"।

লাহিড়ী বললেন, "আর বাকি ১০%? তাহলে তো ওকে আটকে রাখা উচিত ছিল স্যার।"

উপমন্যু বললেন, "ও দোষী হলে, ওকে ছেড়ে রাখলে ও আরো ভুল করবে। যদিও আমার মনে হয় না ও ইনভল্ভড"।

লাহিড়ী বললেন, "কিন্তু ও স্বীকার করেছে, ও ঘটনাস্থলে গেছিল"।

উপমন্যু বললেন, "ঠিক আছে। নজর আছে। পালাবে কোথায়? আচ্ছা, একটা মেমোরি গেম হয়ে যাক। দেখি তোমার কেমন স্মৃতি"।

লাহিড়ী অবাক হয়ে সামলে নিলেন, "ওকে স্যার"।

উপমন্যু বললেন, " তোমার মনে আছে তপোব্রত বলেছিলেন শরত সদনে ওর সঙ্গে অরুণের একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল? এক ভক্ত রেকর্ড করেছিল? সে গানটা আমরা শুনলামও?"

লাহিড়ী বললেন, "হ্যাঁ স্যার। মনে আছে"।

উপমন্যু বললেন, "ক্যাসেটের কভারটা দেখেছিলে?"

লাহিড়ী বললেন, "সাদা কভার ছিল স্যার। আর পেন দিয়ে লেখা ছিল রেকর্ড ২"।

উপমন্যু বললেন, "রাইট। রেকর্ড ১ কোথায় আছে, সেটা কীসের, সে ব্যাপারে তোমার প্রশ্ন এসছিল?"

লাহিড়ী বললেন, "না স্যার। যারা গান করেন, তাদের এরকম অনেক রেকর্ড থাকে, তাদের কাজের জন্যই থাকে। সেটা নিয়ে আমার তেমন কৌতূহল হয় নি"।

উপমন্যু হাসলেন, "আমার হচ্ছে। চল তো একবার, ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে যাই"।

লাহিড়ী বললেন, "এত রাতে?"

উপমন্যু বললেন, "কোন ব্যাপার না। চল"।

লাহিড়ী আর কিছু বললেন না।

তপোব্রত অবশ্য বললেন। বেশ রাগতভাবেই বললেন, "এভাবে একজনকে হ্যাকল করা কি ঠিক অফিসার?"

উপমন্যু বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত তপোব্রতবাবু। কিন্তু আমার ওই প্রথম ক্যাসেটটা কী আছে, জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছে"।

তপোব্রত বেশ কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে বললেন, "বসুন। আপনাদের জ্বালায় রাতেও শান্তিতে ঘুমোতে পারবো না মশাই। উলটে ফ্ল্যাটের লোক আমাকে খুনী ভেবে বসবে"।

উপমন্যু ফ্ল্যাটে ঢুকে সোফায় বসে বললেন, "তা ঠিক। আমি বড় জ্বালাই। দেখাবেন প্লিজ?"

তপোব্রত একটা বাক্স এনে মেঝেতেই বসে পড়ে বললেন, "দেখছি দাঁড়ান। আমার কি নিজেরই মনে আছে মশাই?"

উপমন্যু বললেন, "দেখুন দেখুন। আমার অনেক সময়"।

তপোব্রত হাই তুলতে তুলতে কতগুলো সাদা ক্যাসেট বের করে মেঝেয় রাখলেন। কোনটায় রেকর্ডিং ১ লেখা, কোনটায় ২। এরকম ৫টা ক্যাসেট আছে।

উপমন্যু এক নম্বরটা তপোব্রতর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “চালান”।

তপোব্রত ক্যাসেটটা চালালেন। “ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা”।

লাহিড়ী বলে উঠলেন, “অর্ণব সরকার”।

তপোব্রত বললেন, “হু”।

উপমন্যু বললেন, “তিন নাম্বারটা চালান”।

তপোব্রত সেটাও চালালেন। এবারেও অর্ণবের গান “শুধু তোমার বাণী নয় গো”। চার আর পাঁচ নম্বর ক্যাসেটও অর্ণবেরই গান।

তপোব্রত ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন। উপমন্যু বললেন, “সবাই জানে তপোব্রতবাবু। সমীরণবাবুর থেকেও শুনেছি। আপনি অর্ণবের সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতেন। অথচ আমাকে কিচ্ছু বললেন না সেদিন”।

তপোব্রত বললেন, “বললেই তো সাসপেক্ট করে দিতেন। সে কারণেই বলি নি। ওই স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি মারি নি। মারবো ভেবেছিলাম। অর্ণব যে প্রায় অনাহারে মরল, তার জন্য অরুণ দায়ী”।

উপমন্যু বললেন, “আপনি করেছিলেন অনেকটাই”।

তপোব্রত বললেন, “করেছি। লাভ হয় নি তাতে। বাঁচাতে পারি নি”।

উপমন্যু বললেন, “আর কিছু বলার আছে আপনার?”

তপোব্রত চুপ করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বললেন, “বলার নেই কেন? আছে। আমি অর্ণবকে ভালবাসতাম। তখন তো লোকে হাসতো, এখনো হাসে। মানুষ হেসেই মানুষের ফিলিংসকে উড়িয়ে দিতে শিখে গেছে। তবে আমি আজও স্বীকার করি, ওকে ভালবাসি”।

উপমন্যু বললেন, “কারণ একটা ছিলই তাহলে!”

তপোব্রত বললেন, “অবশ্যই ছিল। আমার সে ক্ষমতা থাকলে আমি তা প্রয়োগও করতাম। কিন্তু আমি নরম। আমার দ্বারা ও কাজ হয় নি”।

উপমন্যু বললেন, “আপনি নরম হতে পারেন, লোক তো রিক্রুট করতেই পারতেন, তাই না?”

তপোব্রত চুপ করে গেলেন। উপমন্যু বললেন, “আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন আপাতত। আপনাকে আটক করা হল”।

তপোব্রত চমকে গিয়ে বললেন, “আমি কিছু করি নি। আমাকে আটকে রাখলে আমার চাকরিটা নিয়ে টানাটানি হবে অফিসার। প্লিজ বুঝুন”।

উপমন্যু বললেন, “বেশ। ক্যাসেটগুলো দিন আপাতত। আমি শুনে আপনাকে ফেরত দেব না হয়”।

তপোব্রত রাগী মুখে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩৭

।।পূর্ব কথা।।

ঝামেলাটা এড়ানো গেল না। হয়েই গেল।

দামানিতে শট শেষ করে বেরোচ্ছিলেন সঙ্গীতা।

ঋতুপর্ণার মুখোমুখি হয়ে গেলেন।

সঙ্গীতা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, ঋতুপর্ণা বললেন, "কথা আছে"।

সঙ্গীতা বললেন, "এখন হবে না। আমার কাজ আছে"।

ঋতুপর্ণা গলা নিচু করে বললেন, "সব কাজ বন্ধ করে দেবো। কোথাও কাজ পাবি না। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে"।

সঙ্গীতা বিস্মিত হয়ে বললেন, "এটা কেমন ইয়ার্কি"?

ঋতুপর্ণা বললেন, "ইয়ার্কি না তো। সিরিয়াসলি বললাম। কথা আছে। আয়"।

সঙ্গীতা চারদিকে লোক আছে দেখে আর কিছু বললেন না। মেক আপ রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঋতুপর্ণা বললেন, "হেমন্তের সঙ্গে অরুণের দেখা করানোটা জরুরি ছিল?"

সঙ্গীতা হাসার চেষ্টা করলেন, "উফ! এই ব্যাপার? আমি ভাবলাম কী হল আবার?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "ন্যাকামি করিস না। তোদের ব্যাপারটা শুরু থেকে আমি সব জানি, কিন্তু কোনদিন কিছু বলি নি। বলার প্রয়োজনও বোধ করি নি। এখন ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার কিন্তু আমাকে দেখতে হবে"।

সঙ্গীতা বললেন, "তুই তাহলে ওকে টাকা দে। ওর কাছে টাকা কোথায় এখন? কী করবে বল?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "তা হলে এমন একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় করাতে হল, যে আসলে একটা ডাকাতেরও অধম? কেন? তোর ব্যাঙ্কে কেউ চেনাশোনা ছিল না?

সঙ্গীতা বললেন, "কেউ দেবে না। কী দেখে দেবে? কিছু থাকলে তো ভাবা যেতো"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "কত নিয়েছে?"

সঙ্গীতা বললেন, "জানি না, তবে দশ লাখ ফেরত দিতে হবে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "শুধু বিছানা গরম করেই হল না, তাই না? একবারে সব শেষ করে দিতে হল?"

সঙ্গীতা বললেন, "তুই এটা নিয়ে ভাবছিসই বা কেন? তুই বিয়েটা থেকে বেরিয়ে এসেছিস অনেক দিন। এখন আবার অকারণ এসব নিয়ে ভাবার তো কোন কারণ দেখি না! যাক গে, এত বাজে বকে লাভ নেই, আমার কাজ আছে। আমি আসি"।

ঋতুপর্ণা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "উঁহু, ওসব আমি শুনবো না। ইনফ্যাক্ট আমি কিছুই শুনতে চাইছি না। তুই ওই হেমন্ত শনিটাকে ওর ঘাড় থেকে নামা"।

সঙ্গীতা বললেন, "বিশ্বাস কর, আমার এখানে কিছু করার নেই। অরুণ একটা ওয়ে আউট চাইছিল লোন ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, আমি ওকে হেমন্তের নাম্বার দিয়েছি। ব্যাপারটা এখানেই শেষ। তারপর ওরা কী নিয়ে কথা বলেছে, ওদের মধ্যে কী টার্মস এন্ড কন্ডিশন্স আছে, আমি কিচ্ছু জানি না, জানতে চাইও না"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "নাম্বার দে হেমন্তের"।

সঙ্গীতা বললেন, "ওহ, ওটা তো আমার ফোনে আছে। ফোন আমি বাড়িতে ফেলে এসেছি। গিয়ে দেব"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "দু মিনিট লাগবে বের করতে। এসব আজে বাজে বুঝিয়ে লাভ নেই। আমি চাইছি না অন্য কোন জায়গা থেকে নাম্বারটা দিতে। তুই দে"।

সঙ্গীতা শ্বাস ছেড়ে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে ঋতুপর্ণার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "লোকটাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে এখন সতীলক্ষ্মী সাজছিস। এতটাই উপরে চলে গেছিস যে আমার কেরিয়র খেয়ে নেবার ভয় দেখাচ্ছিস। ঠিক আছে, তোর সময় এখন। কিন্তু মনে রাখিস, দিন সবার আসে। সবার চলেও যায়। আজ যাদের দয়ার উপরে দাঁড়িয়ে আমায় হুমকি দিলি, একদিন ওরাই তোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ভিক্ষে করাবে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "মানে যেটা তুই এখন করছিস? তাই তো? আজ এর বর, কাল তার বর, পরশু কোন একটা হোটেলে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে টাকা নিয়ে শুয়ে পড়ছিস, সেটা করতে বলছিস, তাই তো? লাভ নেই। সেটা হবে না। আমি এসব করবো না। তুই নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করিস না"।

সঙ্গীতার চোখে জল চলে এসেছিল। ঋতুপর্ণা বললেন, "তোদের মত ক্যারেক্টারলেস ক্রিচারদের সঙ্গে কথা বলাও উচিত না। তাও কেন বলি আমি নিজেই জানি না। যাই হোক, এই হেমন্তের শনি নামানোর কাজ তোর। যদি না পারিস, তাহলে আমি বুঝবো তোকে। যা এবার বেরো। কোথায় কোন কর্মযজ্ঞে যাবি বলছিলি, যা এবার"।

সঙ্গীতা ধীর পায়ে মেক আপ রুম ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

ঋতুপর্ণা হেমন্তের কার্ডের ছবি তুলে অম্বরকে পাঠিয়ে লিখলেন, "ডিটেলস নাও"।

৩৮

॥বর্তমান সময়॥

ঋতুপর্ণার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়ালেন উপমন্যু। ডিউটিতে থাকা কনস্টেবল ছুটে এল, "স্যার, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করবেন?"

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। তুমি এখানেই থাকছো সারাদিন?"

কনস্টেবল বলল, "হ্যাঁ স্যার। এখানেই থাকছি"। উপমন্যু বললেন, " দিন রাত ভাগ করা আছে?"

কনস্টেবল মাথা নাড়ল।

উপমন্যু কলিং বেল বাজালেন। রূপা দরজা খুলল। উপমন্যু বললেন, "ম্যাডাম আছেন? আমি ফোন না করেই চলে এলাম"।

রূপা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। কনস্টেবল কৌতূহলী চোখে দেখছিল। উপমন্যু তাকে বললেন, "তুমি চেয়ারে গিয়ে বস। আর প্রেসের সামনে কিছু বোল না যেন"।

কনস্টেবল লজ্জা পেয়ে চেয়ারে চলে গেল। উপমন্যু ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলেন।

ঋতুপর্ণা ড্রইং রুমে বসে টিভি দেখছিলেন। উপমন্যুকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "সব ঠিক আছে অফিসার? প্লিজ বসুন"।

উপমন্যু বসে বললেন " আপনাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ম্যাডাম। আমি একা নই, ওই আমার সঙ্গে যে ছেলেটা কাজ করছে, ও নতুন এসেছে, ফ্রেশ ব্লাড, অভিজ্ঞতা কম কিন্তু উৎসাহ প্রবল, ও পর্যন্ত আপনাকে বুঝে উঠতে পারছেন না"।

ঋতুপর্ণা অবাক হলেন, "মানে?"

উপমন্যু বললেন, "অতোগুলো টাকা খোরপোষ নেবার পর আপনি হঠাৎ অরুণের প্রতি অতোটা কেয়ারিং হয়ে গেলেন কেন"?

ঋতুপর্ণা মাথা নিচু করলেন, "মায়া বলতে পারেন। এক ছাদের তলায় ছিলাম তো। সেটার জন্যই..."

উপমন্যু বললেন, "আর সেই মায়ার কারণ? অপরাধবোধ?"

ঋতুপর্ণা চমকালেন, "মানে"?

উপমন্যু বললেন, "অরুণকে আদৌ কোনদিন ভালোই বাসেন নি আপনি, তাই না?"

ঋতুপর্ণার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "আপনিও কি এই সব টর‍্যাশ নিউজ চ্যানেলগুলোর খবরে প্রভাবিত হয়ে গেলেন মিস্টার বোস?"

উপমন্যু হাসলেন, "না। আমাকে কারো কথায় প্রভাবিত হতে হয় না। কিন্তু আপনি বলুন, জোর করে দেওয়া বিয়েটা মেনে নিয়েছিলেন কেন"?

ঋতুপর্ণা মাথা নিচু করে বসে রইলেন। হাত কাঁপতে শুরু করল তার। প্রথমে অল্প। পরে প্রবলভাবে।

রূপা দৌড়ে এসে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিল তাকে। ঋতুপর্ণা দুহাতে চোখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

উপমন্যু একটা কথাও বললেন না। প্রায় মিনিট পনেরো পর ঋতুপর্ণা সামলে নিয়ে বললেন, "যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে কোনদিন পাবো না আমি অফিসার। সে অপরাধবোধ আমার বরাবর ছিল। কিন্তু তার কোন দোষ নেই বিশ্বাস করুন। সে এসব করবে না"।

উপমন্যু বললেন, "হতে পারে। সেটা ঠিকও হতে পারে। আমি জানতে পেরেছি ভাল। প্রেস জানতে পারলে কী হবে বুঝতে পারছেন আশা করি"।

ঋতুপর্ণা ধরা গলায় বললেন, " আমি জানতাম আপনি ঠিকই বের করে ফেলবেন। অম্বর বলেছে তাই তো?"

উপমন্যু বললেন, "সেটা ইম্পরট্যান্ট না ম্যাডাম। কিন্তু আমাকে একবার তাকে জেরা করতে হবে। সেটার জন্যই আপনার কাছে এলাম। আপনাকে না জানিয়ে সেটা করতে পারছি না"।

ঋতুপর্ণা কাতর মুখে বললেন, "সবাই জেনে যাবে। যেটা হলে একবারেই ভাল হবে না। আমি তো এই ভয়েই সব সময় অস্থির হয়ে থাকি। বিশ্বাস করুন, ও এসব ভাবতেও পারে না। করলে তো অনেক আগেই করত। এখন এসব কেন করতে যাবে?"

উপমন্যু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "ঠিক আছে ম্যাডাম। আপনি যেটা বলছেন, সেটা মেনে নিচ্ছি। যদিও তদন্তের স্বার্থে সেটা আমার ইগনোর করা উচিত ছিল না। আমি এমনভাবে দেখবো যাতে কেউ জানতে না পারে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "প্লিজ। আপনি চাইলে সেটা সম্ভব। ওই প্রেসের ছেলেগুলো যখনই আমার অজ্ঞাতপরিচয় প্রেমিকের একটা কালো ছায়া দেখিয়ে এজাম্পশান করছে, আমার বুক কেঁপে উঠছে। শুধু ও তো নয়! ওর বউ আছে, দুই সন্তান আছে। তারাও প্রবলভাবে প্রভাবিত হবে"।

উপমন্যু বললেন, "এর কথা অরুণ জানতেন?"

ঋতুপর্ণা মাথা নাড়লেন, "না। বলি নি। বললে অরুণ হয়ত ওর বাড়ি গিয়ে ওর সংসারটাই ভেঙে দিয়ে আসতো। ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ ছিল। ভাল মন্দ কিছু বুঝতো না। সূক্ষ্ম অনুভূতি কম ছিল। এত কিছুর পরেও মানুষটা খারাপ ছিল না"।

ঋতুপর্ণা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। উপমন্যু উঠে দাঁড়ালেন, " ঠিক আছে ম্যাডাম। ভাববেন না। আমি দেখছি ব্যাপারটা। আর আপনার পার্কিংএ একটা স্কুটি দেখলাম, ওটাও আপনার?"

ঋতুপর্ণা বললেন, “ছিল আগে। এখন পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে রূপা বাজার করতে যায় ওটা নিয়ে”।

উপমন্যু বললেন, “ওকে। মেনি থ্যাংকস”।

৩৯

লোকটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন উপমন্যু। ভদ্রলোক প্রথমে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকলেন। বেছে বেছে অনেকগুলো জিনিস কিনে ট্রলিতে রাখলেন। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল বিল দেবার জায়গায় এসে। ট্রলিটা সেখানেই রেখে আবার হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বেশ কয়েকটা বিস্কুট কিনে এনে ট্রলিতে রেখে বিল করালেন। টাকা দিয়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে আবার ব্যাগগুলো সিকিউরিটির কাছে দিয়ে স্টোরে ঢুকে গেলেন।

"ভীষণ কনফিউজড একজন লোক"।

উপমন্যু বিড়বিড় করলেন।

ধবধবে ফরসা গায়ের রং। সুন্দর চেহারা। কোঁকড়ানো চুল। ভদ্রলোক স্টোর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লিফটে গেলেন। উপমন্যু দৌড়ে লিফটে উঠে গেলেন। ভদ্রলোক পার্কিং-এর ফ্লোরে সুইচ টিপলেন।

উপমন্যু বললেন, "আপনি যেটা কিনতে এসেছিলেন, সেটা কিনতেই ভুলে গেছেন তাই না?"

ভদ্রলোকের মুখ শিশুদের মত হাসিতে ভরে উঠল। বললেন, "ঠিক বলেছেন তো। আপনি কী করে জানলেন? আপনি কি ফেস রিডার?"

উপমন্যু ঘাড় নাড়লেন, "না না। সেসব না। আমি আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাইছিলাম। সবার সামনে সেটা সম্ভব না। পার্কিং-এ যদি একটু কথা বলা যেত, ভাল হত"।

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়েও সামলে নিলেন। বেসমেন্টের দরজা খুললে ব্যাগগুলো নিয়ে এগোলেন, গাড়ির চাবি খুলে ব্যাক সিটে সেগুলো রেখে বললেন, "বলুন"।

উপমন্যু বললেন, "ঋতুপর্ণা ম্যাডামের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটার ব্যাপারে যদি বলেন"।

ভদ্রলোক হাসলেন, "আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম। আপনি..."

উপমন্যু বললেন, "উপমন্যু বোস। অরুণবাবুর মার্ডার কেসটা আমি দেখছি"।

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক ঠিক। আপনার নাম টিভিতে শুনেছি আমি। তবে আপনি ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি নন। সামনে আসতে চান না। আপনাকে কেউ কোন প্রশ্ন করলে দেখেছি আপনি সরে যান"।

উপমন্যু বললেন, "ঠিক। আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেশ ভাল। আপনাকে ভুলো মনের ভেবেছিলাম"!

ভদ্রলোক বললেন, "কলেজে পড়াই। এটুকু না থাকলে চাকরি পেতাম না যে"।

উপমন্যু বললেন, "পড়ানোর সূত্রেই সম্পর্কটা হয়েছিল?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "ঠিক। আমি তখন বিবাহিত। আমার ছেলে থ্রিতে পড়ে। আমি জড়িয়ে গেলাম। পাপ ভাবলে পাপ। আমি ভাবতে পারি নি তখন। এদিকে আমি আমার বিয়েটাও ভাঙতে পারলাম না। যা হয়। ঋতুকে সরে যেতে হল"।

উপমন্যু বললেন, "অরুণের উপর রাগ হয় নি কোনদিন?"

ভদ্রলোক বললেন, "নাহ। আমার কারো উপর রাগ হয় নি নিজের উপর ছাড়া। আমি আমার স্ত্রীকে ঠকিয়েছি, ঋতুকে ঠকিয়েছি। আমার থেকে খারাপ মানুষ আর কেউ হতে পারে না"।

উপমন্যু বললেন, "আমরা সবাই খারাপ মানুষ। আপনি একা নন"।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি আমাকে ইন্টারোগেট করতে এসেছেন তাই না? আমি কোথায় ছিলাম সেদিন জানতে চান?"

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, "না। ওসব জানার দরকার নেই। আমি জানি আপনি এসব করেন নি। বরং ওই সময়ে আপনি ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ সত্যিই শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আজ জ্যোৎস্না রাতে লিখেছিলেন, না এটা একটা মিথ"।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনিও এটা নিয়ে ভাবেন"?

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আমি জানতে চাই না। সৃষ্টির মুহূর্ত নিয়ে আমি ভাবতে চাই না"।

ভদ্রলোক বললেন, "আমিও না। অথচ অরুণের গান আমার ভাল লাগতো। অরুণের গায়কী ভাল। অনেকে অর্ণব সরকারের কথা বলেন, আমি অর্ণব শুনেছি। আমার অরুণের গানই বেশি ভাল লেগেছে"।

উপমন্যু বিস্মিত হয়ে বললেন, "তাই?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ। অরুণের গলায় অন্য আবেগ আছে। অরুণ গানের মানে ভীষণ ভাল বুঝতেন"।

উপমন্যু বললেন, "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্নটা অরুণই বেশি ভাল গেয়েছিলেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "কোন ডাউট নেই এই ব্যাপারে। আমি অরুণকেই ভোট দেবো। ডেথ সিকোয়েন্সটাও অসাধারণ। এভাবে চলে যেতেই তো চেয়েছিলাম। সবাই পারে না। অরুণ পেরেছে"।

উপমন্যু ম্লান হাসলেন, "খুনের জায়গার সঙ্গে একমাত্র এই একটা জায়গাটা আপনার সঙ্গে মিলছে। আপনি ছাড়া এত প্যাশনেটলি কেউ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন গান চালিয়ে আসতো না ওখানে"।

ভদ্রলোক শ্বাস ছাড়লেন, "তা ঠিক। তবে আমি নই। আমি এ কাজ করবো না"।

উপমন্যু বললেন, "ঠিক। আপনি করবেন না। আমি আসি তবে?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "ভাল থাকুন"।

উপমন্যু প্রত্যুত্তরে বললেন, "আপনিও ভাল থাকুন"।

ভদ্রলোক বললেন, "ধন্যবাদ"।

উপমন্যু ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রেখে সে লিফটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

৪০

লাহিড়ী ফোন করছেন। উপমন্যু মলের বাইরে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। ফোন ধরে বললেন, "বল"।

লাহিড়ী বললেন, "কোথায় স্যার?"

উপমন্যু বললেন, "একটা পার্সোনাল কাজে এসেছি সাউথে। তোমার কোন আপডেট আছে কি?"

লাহিড়ী বললেন, "কয়েকটা ফুটেজ পেয়েছি স্যার। আপনার দেখা দরকার"।

উপমন্যু বললেন, "পাঠাও"।

লাহিড়ী বললেন, "অফিসে আসবেন না"?

উপমন্যু হাই তুললেন, "গেলেও হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে ছাড়ো, পাঠাতে হবে না। আমি যাচ্ছি"।

আরেকটা ফোন আসা শুরু হল। উপমন্যু দেখলেন অজয় দাস ফোন করছেন। লাহিড়ীর ফোন কেটে উপমন্যু অজয়ের ফোনটা রিসিভ করলেন, "বলুন"।

অজয় বললেন, "মিস্টার বোস, আপনি আমার অফারটা রি কন্সিডার করতে পারেন, শুরুতেই ওভাবে আমাকে কাটিয়ে দিয়ে কি ভাল করলেন?"

উপমন্যু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "কেন? কী হয়েছে?"

অজয় বললেন, "আপনি কার জন্য মলে বসে আছেন?"

উপমন্যু বিরক্তির শ্বাস ছাড়লেন। অজয় তার পেছনে লোক লাগিয়েছে। প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "আপনি আপনার এক্তিয়ারের বাইরে কথা বলছেন, সেটা বুঝতে পারছেন তো?"

অজয় বললেন, "আর আপনি যে জিনিসটা চেপে যেতে চাইছেন, সেটা বেরিয়ে এলে কী বিস্ফোরণ ঘটবে, সেটাও আশা করি বুঝতে পারছেন?"

উপমন্যু চুপ করে রইলেন। উত্তর দিলেন না।

অজয় বললেন, "মেনে নিন অফারটা। আপনার এমনি রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে। মাইনে কড়ি দিয়ে ঘর চলবে না"।

উপমন্যু চোখ বন্ধ করে দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "আপনার অফারটা নিয়ে আমি ভাবছি। দুটো দিন সময় দিন"।

অজয় বললেন, "সিরিয়াসলি?"

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। একবারেই। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ফোন করবো আপনাকে"।

অজয় বললেন, "আমার নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। থ্যাংকস আ লট"।

উপমন্যু বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম"।

ফোন কেটে এলাকাটা ভাল করে দেখলেন তিনি। মলে অনেক লোক ঢুকছে। আশে পাশে দু চারজন ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে ফলো করছে কে?

আরেকটু ভালভাবে খুঁজতেই বুঝতে পারলেন, এ ছেলেটা অজয়ের চ্যানেলে কাজ করে। ব্যাক স্টেজে থাকে। হাত নেড়ে ডাকলেন। ছেলেটা লাজুক মুখে এগিয়ে এল।

উপমন্যু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "তোমার নামটা কী যেন। মনে করতে পারি না আজকাল। বয়স বেড়েছে তো"!

ছেলেটা বলল, "তাপস স্যার"।

উপমন্যু খুশি হবার মুখে করলেন, “রাইট, তাপস। তা তোমাকে অজয়বাবু আমার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছেন, তাই তো?”

তাপস মাথা নিচু করল।

উপমন্যু বললেন, “কী দেখেছো? কী রিপোর্ট দিলে?”

তাপস সসংকোচে বলল, “এই তো স্যার এখানে এসেছিলেন, ঘুরছেন সেটাই বলেছি”।

উপমন্যু বললেন, “বুঝলাম। তুমি অফিসে কাজ ছাড়াও গোয়েন্দাগিরিও কর? না তোমাদের দিয়ে এসব করায়?”

তাপস হাসল, “চাকরি স্যার। কী করব?”

উপমন্যু বললেন, “তা বটে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তোমাদের দিয়ে করায়। তোমাদের আর কী করার আছে?”

তাপস চুপ করে রইল।

উপমন্যু বললেন, “চল। হেড অফিস যাচ্ছি। যাবে? ওখানেও গোয়েন্দাগিরি শেখাবো না হয় তোমায়”।

তাপস ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “অফিসে কাজ আছে স্যার। এখন যাই”।

উপমন্যু কিছু বলার আগেই তাপস পালালো।

উপমন্যু সেদিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, “নিউ জেনারেশন! হোয়াট আ ওয়েস্ট! ছি...”

আরেকটা চা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে অফিসের দিকে রওনা দিলেন। ঢুকলেন যখন, তখন লাহিড়ী মন দিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখছিলেন। উপমন্যু বললেন, “এটা ওই পাড়ার মোড়েরটা, তাই তো?”

লাহিড়ী বললেন, “হ্যাঁ স্যার, ঠিক”।

উপমন্যু বললেন, “কী দেখলে? তেমন কিছু আছে?”

লাহিড়ী হতাশায় মাথা নাড়লেন, “না। সেরকম কিছু না। এটা অনেক দূরের ক্যামেরা। কোথায় অরুণের বাড়ি আর কোথায় পাড়ার মোড়?”

উপমন্যু বললেন, “সে হোক। দেখি। চালাও শুরু থেকে”।

লাহিড়ী আবার রাত বারোটা থেকে ক্লিপ চালানো শুরু করলেন। তেমন কেউ থাকলে এভাবে বোঝাও সম্ভব না। তবু উপমন্যু মন দিয়ে দেখে যেতে লাগলেন।

৪১

।।পূর্ব কথা।।

বালিতে অনুষ্ঠান। স্টেজ দিয়েছে।

অরুণ মদের ঘোরে টলতে টলতে স্টেজে উঠে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন, গাইবেন "এই করেছ ভালো নিঠুর হে"।

গান শুরু করেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বেসুরো গাইতে শুরু করলেন। গানের কথাও ভুলে গেছেন। "এমনি করে"র জায়গায় "তেমনি করে" গেয়ে বসলেন।

প্রথমে একজন বয়স্ক শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন। একে একে সকলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অরুণ গান থামিয়ে চিৎকার করলেন, "কী হয়েছে? সমস্যা কী?"

অর্গানাইজাররা এসে অরুণকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দিতে গেলেন। অরুণ হাত পা ছুঁড়তে শুরু করে দিলেন। বেশ কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে গেল। কোন মতে অরুণকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। অরুণের গলা ভেঙে গেছে। ওই অবস্থাতেই চিৎকার করে যেতে লাগলেন। অর্গানাইজাররাই গাড়ি পাঠিয়েছিল। সে গাড়ির ড্রাইভারকে অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগলেন। ড্রাইভার শুনল না। গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। বালি ব্রিজ পেরোনোর পর অরুণ ড্রাইভারের মাথায় চাটি মারতে শুরু করলেন।

ড্রাইভার এবারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অরুণকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চলে গেল। অরুণ চিৎকার করলেও শুনল না। অরুণ রাস্তার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ লাফ ঝাঁপ দিয়ে বসে পড়লেন। পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন দিতে গিয়ে দেখলেন লাইটার নেই। রাস্তার পাশে উবু হয়ে বসে রইলেন।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। অরুণ দেখলেন গাড়ির মধ্যে ঋতুপর্ণা বসে আছেন। অরুণ বললেন, "তুমি কি ফলো করছো আমাকে?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "ফলো করার দরকার পড়ে না। আমার কাজ ছিল। ফিরছিলাম। তোমাকে এই এলাকার সবাই দেখছে। চলে এসো"।

অরুণ বিনা বাক্যে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

ঋতুপর্ণা বললেন, "কোথায় গেছিলে?"

অরুণ বললেন, "বালিতে"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "নামিয়ে দিয়েছে এভাবে?"

অরুণ উত্তর দিলেন না।

ঋতুপর্ণা চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করলেন ঋতুপর্ণাই, বললেন, "তোমার লোনের খবর কী?"

অরুণ বললেন, "তোমার সেটা জানার দরকার নেই"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "দরকার আছে নাকি পরে দেখা যাবে। কিন্তু বাড়িটা তো একা তোমার না। তোমার বাবা মায়ের বানানো বাড়ি। নিজের পরিশ্রম দিয়ে বাড়িটা তৈরি করলে সেটার মর্ম বুঝতে। সেটা যখন বুঝছো না, তখন আমাকে বুঝতে হবে"।

অরুণ বললেন, "তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না। আমার রয়্যালটির টাকা আমি যাতে না পাই, সেটার ব্যবস্থা করে তুমি অনেক উপকার করেছো। আর তোমাকে কোন উপকার করতে হবে না"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "মদ খেয়ে আর এসকর্টদের পেছনে যাতে না ওড়াও, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাড়ি বিকিয়ে দেওয়ার জন্য করা হয় নি"।

অরুণ রেগে গেলেন, "এসকোর্ট? অন্য মেয়েরা এসকোর্ট? কেন? তুই কী? তুই কী করে কাজ পাস আমি জানি না? আজকে এক বাবু, কাল আরেকবাবু ধরে বেড়াস? অন্য মেয়েদের এসকোর্ট বলার অধিকার কে দিয়েছে তোকে?"

ঋতুপর্ণা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "বাড়ি গিয়ে একবার নিজেকে দেখো তুমি। তোমার কী অবস্থা হয়েছে, নিজেকে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমাকে এসব বলে কি কোন লাভ হবে? আর দয়া করে আমাকে বেশি বাজে কথা বোল না। নিশ্চয়ই পকেটে আর এক টাকাও পড়ে নেই। এখানে নামিয়ে দিয়ে গেলে ফিরবে কী করে, সেটা বুঝে নিও"।

অরুণ বললেন, "নামিয়ে দে। কে তোর গাড়িতে উঠতে চায় রে রাস্তার মেয়ে? তোর কী ধারণা তুই না থাকলে আমি ফিরতে পারবো না? এই ড্রাইভার, গাড়ি দাঁড় করা। আমি নেমে যাবো"।

ঋতুপর্ণা কড়া গলায় বললেন, "একদম দাঁড় করাবে না। ওকে বাড়িতে নামিয়ে দাও"।

অরুণ তবু থামলেন না। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন।

ঋতুপর্ণা বললেন, "নিজেকে মোটামুটি শেষ করেই এনেছ। আর তো কিছু বাকি নেই। এখনও সময় আছে। শুধরে যাও"।

অরুণ বললেন, "তুই নিজেকে শোধরা। আমাকে বলতে আসবি না"।

ঋতুপর্ণা চুপ করে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর অরুণের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। ঋতুপর্ণা বললেন, "যাও দয়া করে"।

অরুণ কোনমতে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

ঋতুপর্ণা অম্বরকে ফোন করলেন, অম্বর ফোন ধরতেই বললেন, "নজর রেখো"।

অম্বর বলল, "হ্যাঁ ম্যাম। ভাববেন না"।

ঋতুপর্ণা ফোন কেটে ড্রাইভারকে বললেন, "চল। ফ্ল্যাটে"।

৪২

।।বর্তমান সময়।।

ঋতুপর্ণা।

ঋতুপর্ণার প্রফেসর (নাম হোক মিস্টার এক্স)

সঙ্গীতা।

অঙ্গীরা।

প্রত্যুষা।

অম্বর (ধুস)।

অজয় দাস।

হেমন্ত।

তপোব্রত

অর্ণব (মৃত)।

তমালতরু।

সাধন।

অনমিত্র।

রাত বারোটা বাজে। ফিরেছেন কিছুক্ষণ আগে।

নামগুলো নোটপ্যাডে লেখা। উপমন্যু নোটপ্যাড খোলা রেখে চুপ করে বসে আছেন। মাথা খাটাতে ইচ্ছে করছে না। পিয়ালী রান্না ঘরে। উপমন্যুর খাওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। পিয়ালী সকালের রান্না করে রাখছেন। উপমন্যু ফিরে এসেই জানিয়েছেন পরদিন ভোরে বেরোবেন। এরকম ব্যাপার থাকলে পিয়ালী আগের দিনই রান্না করে রাখেন। এখন সে কাজটাই চলছে।

কয়েক মিনিট আরও বসে থেকে উপমন্যু উঠলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিঙ রুমে গিয়ে বসলেন।

পিয়ালী বললেন, "কী ব্যাপার? মাথা হ্যাং করে গেছে নাকি?"

উপমন্যু হাসলেন, "সেটা স্বাভাবিক। গান শুনবে এখন?"

পিয়ালী বললেন, "মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মাঝরাতে গান শুনবো? লোকজন এসে তাড়িয়ে দেবে"।

উপমন্যু বললেন, "আরে কিচ্ছু হবে না। শোনোই না। বাইরে সাউন্ড যাবে না"।

পিয়ালী কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, "যা পারো কর। আর ভাল্লাগে না বাপু"।

উপমন্যু হাসতে হাসতে পুরনো ক্যাসেট প্লেয়ারটা বের করে তপোব্রতবাবুর থেকে নিয়ে আসা একটা ক্যাসেট চালালেন।

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন" গানটা বাজতে শুরু করল।

পিয়ালী বললেন, "এখন রাতের বেলা এসব সেন্টিমেন্ট খাওয়াচ্ছো কেন বাপু?"

উপমন্যু বললেন, "গলাটা ভাল না?"

পিয়ালী বললেন, "হ্যাঁ। ভাল। কিন্তু এটা অরুণবাবুর গলা না। ও গলা আমি চিনি"।

উপমন্যু বললেন, “হ্যাঁ। অরুণের গলা না এটা। অর্ণবের গলা। অর্ণব চলে গেছেন। বেঁচে নেই। তবে ওর মৃত্যুর জন্য অরুণের পরোক্ষ হাত আছেই। দলাদলি করে, ক্রমাগত কোণঠাসা করে অর্ণবের সব কাজে সাবোতাজ করে একপ্রকার মানসিকভাবে খুন করেছিলেন অরুণ”।

পিয়ালী বললেন, “মানে? তাহলে অর্ণবের কাছের কেউই মেরেছে? এর প্রতিশোধ নিয়েছে?”

উপমন্যু হাসলেন। পিয়ালী বললেন, “বল না। এরকম করে হাসছ কেন?”

উপমন্যু গানটা বন্ধ করে বললেন, “ঋতুপর্ণার কথায় আসি। একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ককে বিয়ে করলেন। জানতেন ভদ্রলোক। ভালো লোক। দেখা গেল বিয়ের পর বউয়ের উপর যতরকম চাপ দিয়ে তাকে মানসিকভাবে শেষ করে দিতে শুরু করলেন। অরুণের খেয়াল রেখে গেছেন, তাও অরুণ তাকে যেখানে পেরেছেন অপমান করেছেন। চেষ্টা করে গেছেন যাতে ঋতুপর্ণার কেরিয়ার শেষ হয়ে যায়। পারেন নি তবু কখনো ভাল চান নি। ঋতুপর্ণার তার এক্স হাজব্যান্ডের উপর রাগ হতেই পারে। ধরে নাও একজন ভাড়াটে খুনী নিয়ে... ”

পিয়ালী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, উপমন্যু বলে চললেন, “কিংবা ধর ঋতুপর্ণার সিক্রেট প্রেমিক। কলেজ প্রফেসর। পারফেক্ট কালচারাল মানুষ। এমন সিন তৈরি করার আদর্শ লোক। ঋতুপর্ণাকে যে লোকটা এত জ্বালাতন করেছে, তাকে সরাতে চাইতেই পারেন তিনি... কিংবা অরুণের এসকর্ট অঙ্গীরার বর। মারতে চাইতেই পারেন অরুণকে। তার সংসার ভেঙে দিয়েছেন অরুণ। কিংবা ধর হেমন্তর ভাড়াটে ছোকরা সাধন। অরুণকে সম্মান করত ছেলেটা, কিন্তু অরুণ কী করল? এত জঘন্য ব্যবহার করল ওর সঙ্গে, ওসব ছেলের তো এই কাজ করা বা হাতের খেল। করতেই পারে...”

পিয়ালী হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লেন, “ধুর! এতো আগাথা ক্রিস্টির গল্পের প্লট হয়ে যাচ্ছে। তুমি সবাইকেই খুনি বানিয়ে দিচ্ছো। আর কে বাকি রইল?”

উপমন্যু বললেন, “সঙ্গীতা! ওর বরের বিয়ের পর অরুণের সঙ্গে সঙ্গীতার সম্পর্ক তৈরি হল, অরুণের ডিভোর্সও হল কিন্তু অরুণ ওকে বিয়ে করলেন না। ঠিক কাটিয়ে দিলেন। আবার তমালতরুও হতে পারেন! লোকের ইগো মারাত্মক। যে অরুণ ওকে মেরেছেন সবার সামনে তাকে উনি মারতে চাইতেই পারেন”।

পিয়ালী বললেন, “সঙ্গীতাকে অরুণ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করে নি? এটা তো নিউজ চ্যানেল বলছে না”!

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, “আমিও বলছি না। এরকম কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু হতে পারে। না হবার কী আছে?”

পিয়ালী ভ্যাব্যাচ্যাকা খেয়ে বসে থেকে বললেন, “তাহলে? কে? কার এত রাগ আছে?”

উপমন্যুর ফোন বাজছিল। তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ফোন ধরতে দৌড়লেন, “সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তরটা এই ফোনেই আছে”।

পিয়ালী আর্তনাদ করে উঠলেন, “অ্যাই, এত ধোঁয়াশায় রেখো না, আমি পাগল হয়ে যাবো”।

কী কথা বললেন কে জানে, মিনিট পাঁচেক পর উপমন্যু তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, “নৈনিতালের ব্যাগ গোছাও। ফিরে এসে বলছি সব”।

পিয়ালী কাঁদো কাঁদো হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন...

৪৩

।।পূর্ব কথা।।

।।খুনের দুদিন আগে ।।

রাত এগারোটা।

অরুণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। মাথা ধরে আছে। বিকেলে অনেকটা মদ খেয়েছিলেন। এখন নেশাটা নামছে কিন্তু মাথা ধরে গেছে। মদের এটাই একটা সমস্যা। মাথা হ্যাং করিয়ে দেয়। হ্যাং ওভার কাটাতে আরও মদ খেতে হবে। মদ কেনার টাকা নেই। ভাল করে সব খুঁজে টুজে দেখেছেন, কোথাও কিছু নেই। একটা ছেলে আছে, পুরনো জিনিস কেনে। তার কাছে ঘড়ি বিক্রি করে মদ কিনেছেন। আগে দামী স্কচ খেতেন। এখন কমদামী মদে নেমেছেন।

কলিং বেল বাজল। অরুণ বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখন কে এল?"

টলতে টলতে গিয়ে দরজা খুললেন। দরজায় একটা ব্রিফকেস রাখা।

অরুণ অবাক হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "একী রে! এটা কী?"

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন কোথাও কেউ নেই। অরুণ বিস্মিত হয়ে ব্রিফকেসটা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ব্রিফকেসে কোন লক নেই। অরুণ খুলে দেখলেন টাকা ভর্তি। টাকা ধরে বুঝলেন অনেকগুলো টাকা। নিজের মনে বললেন, "বাওয়া। কে রে? নকল নোট নাকি?"

ভাল করে দেখলেন নোটগুলো। না। নোটগুলো কোনটাই নকল না। গুণে নিলেন। খুশি হয়ে বললেন, "যাক। হেমন্ত ব্যাটার ধার মিটে যাবে"। আলমারি খুলে টাকাগুলো রাখলেন।

ব্ল্যাকে যার থেকে মদ কেনেন, সে ছেলেটাকে ফোন করলেন। ছেলেটা ফোন ধরেই বলল, "স্যার, এখন দামীগুলো ছাড়া এত রাতে কিছু পাওয়া যাবে না"।

অরুণ বললেন, "দামীই দিয়ে যাও"।

ছেলেটা বলল, "ধারে হবে না স্যার। বুঝতেই পারছেন আমার ব্যবসাটা কতটা চাপের। কখন পুলিশ তুলে নিয়ে যায় আমি নিজেই জানি না"।

অরুণ বললেন, "না না। ধারে কে নেবে? ক্যাশ দিয়ে দেবো। চলে এসো নিয়ে"।

ছেলেটা বলল, "ঠিক আছে স্যার। রাতে কিন্তু টাকা নিয়ে কিচাইন করব না স্যার। গিয়ে যেন ঝামেলা করতে না হয়"।

অরুণ বললেন, "আরে বাবা, আমি কোনদিন তোমার সঙ্গে টাকা নিয়ে ঝামেলা করেছি? এসো"।

ছেলেটা "ঠিক আছে" বলে ফোন কেটে দিল। অরুণ সোফায় বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু আগেই ভাবছিলেন আত্মহত্যাটা কেমন হলে ভাল হয়। জীবনের এমন একটা জায়গায় চলে এসেছেন নিজে স্পষ্টই বুঝতে পারছেন তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা একবারে ফুরিয়েছে। একবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছেন।

বেঁচে থাকা অনেকভাবে যায়। রাস্তায় বসে ভিক্ষে করে, লঙ্গরখানায় খেয়েও বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু তিনি তো কোনদিন সেভাবে বেঁচে থাকতে চান নি! তিনি চেয়েছিলেন রাজার মত বেঁচে থাকতে। যখন চাইবেন, দামী মদ খাবেন, যে এসকর্টকে চাইবেন, তাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবেন, এমনটাই তো তার জীবনের লক্ষ্য ছিল।

হেমন্তের থেকে টাকা নেওয়ার পরে কদিন চলল। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন এভাবে চলবে না। অনমিত্র টাকা আটকে দিচ্ছে। তিন লাখ টাকার রয়্যালটি পাওয়ার হলে পঁচিশ হাজারটাকা আসতে শুরু করল এক সময়। এদিকে টাকা আসার আগেই সব খরচ করে ফেলছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছেন কাকে কী দেবেন। অঙ্গীরাকে অতোগুলো টাকা দিতে হল। শুধু শুয়েই ক্ষান্ত হন নি। এদের জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছিলেন।

অঙ্গীরাকে পিং করলেন হোয়াটস অ্যাপে। বলাই থাকে দূরে থাকলে সেক্স চ্যাট করার জন্য যেন জেগে বসে থাকেন।

অঙ্গীরা জেগে ছিলেন। সেক্স চ্যাট শুরু করে দিলেন।

ছেলেটা মদ দিয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে। অরুণ অনেকগুলো টাকা টিপস দিলেন। ব্ল্যাকে মদ কিনলে এমনিতেই বেশি টাকা দিতে হয়।

অরুণ তার থেকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে কিনলেন। ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, "কালকের মদের দামও দিয়ে দিলেন নাকি স্যার?"

অরুণ উদাস গলায় বললেন, "খরচ কর। তোমরা গরীব মানুষ। তোমাদের কত কাজে টাকা লাগে। যাও। ফুর্তি কর"।

ছেলেটা অবাক হলেও খুশি হয়ে চলে গেল।

অরুণ দরজা বন্ধ করে তৈরি হতে শুরু করলেন।

নাহ, আজ ঘরে থেকে সেক্স চ্যাট করার দিন না। হাতে টাকা এসেছে। সেটার সদ্ব্যবহার করা উচিত...

৪৪

।।বর্তমান সময়।।

দিনভর শহরে শীত বোঝা যায় না। রাতে বাইক চালানোর সময় শীত ভালোই মালুম হয়।

তবে উপমন্যুর অভ্যাস আছে। সামান্য উত্তেজনাও হচ্ছে। এতদিনের অভিজ্ঞতায় এই উত্তেজনা আসার কথা না। সুখের ব্যাপার হল, সেটা আসছে। ব্যাপারটা অনেকটা প্রথম প্রেমের অনুভূতির সঙ্গে তুলনীয়। এখনও কোন কেস সলভের কাছাকাছি এলে এমন অনুভূতি হয়। এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

বেশ খানিকটা রাস্তা বাইক চালানোর পর উপমন্যু বাইক দাঁড় করালেন। পকেট থেকে ফোন বের করে ফোন করলেন। একবার রিং হতেই ও প্রান্ত ফোন তুলল, শান্ত গলায় বলল, "বলুন অফিসার"।

উপমন্যু বললেন, "আপনাকে এত রাতে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত"।

ও প্রান্ত বলল, "ঘুমোই নি তো। ঘুমনোর প্রশ্নই নেই। আমি জেগে থাকি। কত বই বলুন তো চারদিকে? এত বই না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ব? ক দিন আর বাঁচব? এর মধ্যে সব বই শেষ করতে হবে তো?"

উপমন্যু হাসলেন, "তা ঠিক। কিন্তু ঋতুপর্ণার এক্স হাজব্যান্ডকে অতোগুলো টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না"।

চুপ করে গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর শোনা গেল, "আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান অফিসার। কী করে বুঝলেন?"

উপমন্যু বললেন, "খুনের দুদিন আগের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে। ওদিন আপনার গাড়ি শেষের কবিতার গলিতে ঢুকেছিল। মিনিট পাঁচেক থেকে বেরিয়েও গেছিল"।

ও প্রান্ত বলল, "খুনটা করার জন্য রেইকি করতে যেতে পারি। টাকা দিয়েছি বুঝলেন কী করে?"

উপমন্যু বললেন, "আপনি খুন করেন নি আমি জানি। টাকা দেওয়া ছাড়া আপনার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না"।

ও প্রান্ত শ্বাস ছাড়ল, "আমার মাঝে মাঝে খেয়াল চাপে। ঋতুর সঙ্গে কথা হয়েছিল অনেকদিন পরে। ঋতু কুঁচকে যাচ্ছিল অপরাধবোধে। ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল কুড়ি লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নেওয়ার ব্যাপারটা। বলল দশ লাখ টাকা দেনা আছে অরুণের। আমি ওকে এ ব্যাপারে ভাবতে বারণ করলাম। ও আর ভাবল না। ও অদ্ভুত ওবিডিয়েন্ট। আমি বলেছি, সে কথাই ওর কাছে বেদবাক্য। ভাবনাটা আমার মাথায় ঢুকে গেল। অতো বড় বাড়ির ছেলে। এত ভাল গায়ক। এভাবে একটা অসভ্য সুদখোর লোকের জন্য পথে এসে দাঁড়াবে? আমার গ্রামের জমি বিক্রির টাকা ছিল। আমি দিয়ে এলাম"।

উপমন্যু বললেন, "আপনি মহানুভব"।

ও প্রান্ত থেকে হাসির শব্দ এল, "নাহ। আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র একজন মানুষ। জীবনে কিছু করতে পারলাম না। আচ্ছা অফিসার, আমাকে কি কোথাও যেতে হবে?"

উপমন্যু বললেন, "নাহ। আপনি পড়ছিলেন, পড়ুন। শুভ রাত্রি"। "শুভ রাত্রি অফিসার"।

ফোন কেটে কয়েক সেকেন্ড আরও দাঁড়িয়ে বাইকে স্টার্ট দিলেন উপমন্যু কোন কোন সম্পর্ক কিছুতেই বুঝে ওঠে যায় না। এ বিষয়টা নিয়ে তিনি আর বেশি ভাবার পথে গেলেন না। তার স্নায়ু ধীরে ধীরে উত্তেজিত হচ্ছিল।

ঋতুপর্ণার ফ্ল্যাটের দরজা থেকে খানিকটা দূরে কনস্টেবল টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন।

উপমন্যু সেদিকে না দেখে ফ্ল্যাটের কলিং বেল বাজালেন। সময় লাগল দরজা খুলতে।

ঋতুপর্ণাই দরজা খুলল।

উপমন্যুকে দেখে বিস্মিত হয়ে ঋতুপর্ণা বললেন, "কোন সমস্যা হয়েছে অফিসার?"

উপমন্যু বললেন, "আপনার ঘরে যে মেয়েটি ছিল, সে কোথায়?"

ঋতুপর্ণা বললেন, "রূপা? ঘুমোচ্ছে। কেন বলুন তো?"

উপমন্যু উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন, শান্ত হলেন ঋতুপর্ণার কথা শুনে। বললেন, "ওহ, আছে? ডাকুন"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "ডাকছি। আপনি আসুন"।

উপমন্যু ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঋতুপর্ণা ঘরের ভেতর থেকে আর্তনাদ করে উঠলেন, "প্লিজ একবার আসুন অফিসার। রূপা কেমন করছে"।

উপমন্যু ঋতুপর্ণার কণ্ঠস্বরের সূত্র ধরে দৌড়ে ড্রইং রুমের পাশের ছোট ঘরে প্রবেশ করলেন। রূপার মুখ থেকে গ্যাঁজলা উঠছে। খাটের পাশের ছোট টেবলে একটা পুরিয়া রাখা।

উপমন্যু বললেন, "সায়ানাইড খেয়ে নিয়েছে রূপা সোরেন। আমার গলার স্বর শুনেই সম্ভবত। ছেড়ে দিন"।

রূপার মাথাটা ঋতুপর্ণা কোলে নিয়ে কাঁদছিলেন। বললেন, "কিন্তু কেন?"

উপমন্যু ক্লান্ত গলায় বললেন, "সেসব পরে বলছি। আগে টিম ডাকি..."

৪৫

।।পূর্ব কথা।।

সূর্যাস্ত হচ্ছে।

ড্যামে সূর্যের আলো পড়ে অপূর্ব দৃশ্য তৈরি হয়েছে। ঋতুপর্ণা মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। এসব দৃশ্য বড় যত্ন করে হৃদয়ের ক্ষতে একটু একটু করে প্রলেপ দেয়।

বিয়ের দু মাস পরে পুরুলিয়া বেড়াতে আসা। অরুণ এর মধ্যেই মদ আর চিকেন পকোড়া নিয়ে বসে পড়েছেন। ঋতুপর্ণা ব্যালকনিতে বসে আছেন। কলকাতা থেকে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে। এই সময়টাই ডিপ্রেশনের মেঘ ভর করে আসে ভয়ংকরভাবে।

ফুল বিক্রি করতে এসেছে একটা মেয়ে। ব্যালকনির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পনেরো ষোল বছর বয়স হবে। অপূর্ব সুন্দর চেহারা। যেন পাথর কুঁদে কোন বিখ্যাত ভাস্কর তাকে তৈরি করেছে। ঋতুপর্ণা মেয়েটার সঙ্গে ভাব জমাতে শুরু করলেন। কথা হচ্ছে। অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, “কী ব্যাপার? এখানেই থাকার প্ল্যান করছো নাকি?”

ঋতুপর্ণা সংকুচিত হলেন, “এই তো কথা বলছি ওর সঙ্গে। তোমার নাম কী যেন?”

মেয়েটা হাসল দাঁত বের করে, “রূপা”।

অরুণ বললেন, “তোর বাবাই কেয়ার টেকার না?”

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল।

অরুণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরে চলে গেলেন...

#

রাত আটটা। ঋতুপর্ণা শুয়ে আছেন চুপ করে। দরজা ঠেলে টালমাটাল অবস্থায় অরুণ ঘরে ঢুকে বললেন, “চল, কলকাতা ফিরতে হবে। ড্রাইভারকে ডেকেছি”।

ঋতুপর্ণা অবাক হয়ে উঠে বসলেন, “মানে?”

অরুণ বললেন, “ও কিছু না। চল চল। কথা কম”।

মিনিট দশেকের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন তারা। অরুণ গাড়িতে থম মেরে বসে আছেন। ঋতুপর্ণা বললেন, “আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কী হল?”

অরুণ বিরক্ত মুখে ঠোঁটে আঙুল দিলেন, “চুপ করতে পারো না? চুপ কর। একসঙ্গে ঘুমোতে দাও না, ছুঁতে দাও না। আমি তো এদিক ওদিক যাবোই। সব জানতে হবে?"

ঋতুপর্ণার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল, "মানে? কী করেছো তুমি?"

অরুণ বললেন, "কিছু করি নি। চুপ করে বসে থাকো"।

ঋতুপর্ণা বললেন, "তবে পালাচ্ছো কেন?"

অরুণ হেসে বললেন, "পালাচ্ছি না। স্টুডিও থেকে অনমিত্র ফোন করেছিল। কাল রেকর্ডিং ফাইনাল হয়েছে। কী আর করব? যেতে হবে তো!"

ঋতুপর্ণা শ্বাস ছাড়লেন, "সেটা বলবে তো! আমি ঘাবড়ে গেছিলাম"।

অরুণ আরো জোরে হাসলেন, "ধুস, চোখ বোজো। আমিও শুই"।

ঋতুপর্ণা শান্ত হলেন। এমনিতেও অরুণের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। না বলারই চেষ্টা করেন।

অরুণ অনেক কষ্টে নিজেকে ঠিক রাখছিলেন। মেয়েটাকে দেখার পর থেকে মাথার ঠিক ছিল না। কেয়ারটেকারের ঘর চলে গেছিলেন।

রূপা রান্না করছিল। তাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে বলল, "বাবা বাজারে গেছে"।

অরুণ দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সম্বিত ফিরেছিল সব কিছু হয়ে যাবার পর। অরুণ জামা কাপড় পরে বেরিয়ে গেলেন।

মানুষের ভাগ্য থাকে। অরুণের ভাগ্যের কোন জবাব ছিল না। মেয়েটার বাবা সেদিন বাজার থেকে ফেরার সময় ট্রাকে চাপা পড়েছিল।

উজাড় হয়ে যাওয়া শরীরের থেকেও রূপার কাছে বাবার মৃত্যু নেমে এল আরও ভয়াবহ হয়ে। পাগলের মত হয়ে গেছিল সে। একা একা বিড়বিড় করত ড্যামের ধারে বসে।

অনিমেষ রায় না থাকলে হয়ত সে আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণ হারাতো।

প্রবল শীতের রাতে রূপা কাতরাচ্ছিল রাস্তায় শুয়ে।

অনিমেষরা ফিরছিলেন দল বেঁধে। রূপাকে দেখে ছুটে এলেন সবাই। সুস্থ করে তুললেন।

প্রথমদিকে রূপা শুধু কাঁদত। একটা সময় গিয়ে কান্না বন্ধ হল। ট্রেনিং শুরু হল তার। আর্মস ট্রেনিং, গেরিলা ট্রেনিং... সব। রূপা দাঁতে দাঁত চেপে ছিল। অরুণের কথা সে কোনদিন কাউকে বলে নি। অনিমেষকেও না।

রূপার দুর্ভাগ্য অবশ্য এখানেও পেছন ছাড়ে নি তার। আবার তাড়া করল। পুলিশের হাতে মারা পড়ল অনিমেষসহ দলের বাকিরা। কপালগুণে শুধু সেই বেঁচে গেল।

মহিলা কমিশনের ম্যাডামরা এসেছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ে। তাদের পায়ে গিয়ে পড়ল সে। ঋতুপর্ণার ততদিনে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। দলের সঙ্গে তিনিও গেছিলেন অযোধ্যায়। পরিবর্তিত রূপাকে চিনতে পারেন নি তিনি। চেয়ারপারসনের সঙ্গে কথা বলে রূপাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন...

৪৬

।।বর্তমান সময়।।

ঋতুপর্ণা থর থর করে কাঁপছিলেন। উপমন্যু ঋতুপর্ণাকে বললেন, "আপনি এই ঘর ছেড়ে বেরোন। প্লিজ ম্যাডাম"।

ঋতুপর্ণা রূপার নিথর দেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোনমতে দেওয়াল ধরে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উপমন্যু পকেট থেকে গ্লাভস বের করে পরলেন। ঘরের সব কিছু ঠিকই আছে। পুরিয়ার কাগজটাকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা কাগজ রাখা আছে টেবিলের উপরে। কাগজটা হাতে নিয়ে উল্টোতে দেখে গেল চিঠি লেখা আছে...

দিদি,

আমি মরতে চাইনি বিশ্বাস কর। মরতে কে চায়? কেউ চায় না। সবাই, সব পরিস্থিতিতেই বাঁচতে চায়। ওই লোকটা যেদিন আমাকে আমার ঘরেই শেষ করে দিল, যেদিন আমার বাপটাও মরে গেল, সেদিনও আমি বাঁচতেই চেয়েছিলাম। উদিনও হামি বাঁচতেই চাঁয়েছিলি।

মরেই যেতাম হয়তো, অনিমেষদাদা না থাকলে। সেও তো রইল না। তারপর কপালজোরে আমি তোমার কাছে এলাম। যেদিন থেকে এসেছি, যেদিন থেকে লোকটাকে দেখেছি, আমি জানতাম, আজকের দিনটা খুব বেশি দূরে নেই। তুমি রাতে এসে ঘুমোতে, আর আমি জেগে থাকতাম। ভোরবেলা হাঁটতে যাবার নাম করে ওই লোকটার বাড়ি দেখে এসেছি রোজ। স্কুটি করে দেখে এসেছি কতবার। কোন কাগজে বেরিয়েছিল লোকটা মরার সময় নাকি ওই গানটা শুনে মরতে চেয়েছে। আমিও ঠিক করে নিলাম, মারার সময় তাহলে ওই গানটাই চালিয়ে মারবো। আমি পুলিশের হাতে যাবো না দিদি। অনিমেষদা আমাদের সে ওষুধ অনেক আগেই দিয়ে গেছিল। আমি সেটা খেয়ে নিলাম। ওই অফিসার দাদাবাবুর হাত থেকে আমি পালাতে পারবো না জানি। কিন্তু আমাকে কেউ ধরবে না। আমি কাউকে আর আমাকে ধরতে দেবো না। মেনতেক কাউকে আর হামকে ধরতেই দিব নাই।

আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হামার বাপটাকেও তুমার ওই লকটাই মারেছিল। কলকাতার লোকেরা টাকা দিয়ে সব করতে পারে। এটাও করেছে। তবে যাই হোক, আমি খুব কম শাস্তি দিয়েছি। এর থেকে অনেক বেশি শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। কইলকাতার বড় লকেদের বলে দিবে দিদি, হামদের কিছু হলে ইভাবেই মইরতে হবেক। হামরা কেউ ছাইড়ব নাই উয়াদের। কনতেই ছাইড়ব নাই।

আমার তোমার জন্য খারাপ লাগে দিদি। তোমার মধ্যে জানি না কেন, সেই আমাকেই দেখতে পাই। আমি জানি না আমি চলে যাবার পর কে তোমার সঙ্গে থাকবে, অনেক মন খারাপ নিয়ে মরলাম। বহুত মন খারাপ লিয়ে মরলম।

ভাল থাইকবে।

রূপা সোরেন।
বাবা- অলক সোরেন।
সোনকুপি গ্রাম।
পুরুলিয়া।

উপমন্যু চিঠিটা পকেটে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ ঘরের জানলা খোলা। জানলার কাছে গিয়ে দেখলেন তাদের গাড়িগুলো ঢুকছে। নিজের মনেই বললেন, "মেয়েটা কি সারাক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করত, কখন আমি আসবো আর কখন বিষ খাবে? হাউ টেরিবল..."

ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলেন ঋতুপর্ণা সোফায় এলিয়ে পড়ে আছেন।

দরজা খোলাই ছিল। লাহিড়ী হাঁফ ধরা অবস্থায় ছুটে এসে বলল, "সব শেষ?"

উপমন্যু বললেন, "হ্যাঁ। সব শেষ"।

লাহিড়ী অভিমানী গলায় বলল, "আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন? সিসিটিভি দেখার সময়ই বুঝেছিলেন, তাই না?"

উপমন্যু বললেন, "সেদিন এখানে আসার আগে ঋতুপর্ণার পারকিঙে ওই স্কুটিটা দেখেছিলাম। ঘটনার দিনের ফুটেজ থেকে ওই সময় রাস্তায় একই স্কুটি দেখলাম। ডটগুলো কানেক্ট করলাম। স্কুটি এই অ্যাপার্টমেন্টেই এসেছিল। সন্দেহজনক আর কিছুই দেখি নি। তখনই প্রথম খটকাটা লাগে। পুরুলিয়ায় এবং বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিতে পাঠালাম মেয়েটার ব্যাপারে। জানা গেল অনেকেই সন্দেহ করে মেয়েটা মাওয়িস্ট গ্রুপে ছিল। বুঝলাম সেক্ষেত্রে পাঁচিল টপকে খুন করে পালানো এর কাছে কোন ব্যাপার না। সিম্পল রিভেঞ্জ। ক্লুটা বড় স্পষ্ট ছিল। তাও আমার মাথায় তখনই আসে নি যে রূপা এই কাজটা করতে পারে। আমরা কোন কোন কাজ করি, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যা হয় না। এটাও তেমনই। এত সাসপেক্টের ভিড়ে রূপার কথা মাথাতেই আসে নি আমার"।

লাহিড়ী বললেন, "কিন্তু কেন? এ মেয়েটা করতে গেল কেন? ঋতুপর্ণা করিয়েছিলেন?"

উপমন্যু চিঠিটা লাহিড়ীর দিকে এগিয়ে দিলেন। লাহিড়ী চিঠিটা পড়ে বললেন, "রেপ করেছিল স্কাউন্ড্রেলটা?"

উপমন্যু শ্বাস ছাড়লেন, "কেন যে সুইসাইড করতে গেল মেয়েটা। বেঁচে থাকতে পারতো। ওকে যাতে কেউ না ধরে, তার দায়িত্ব আমি নিতাম"।

ঋতুপর্ণা উঠে বসেছেন, কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে বললেন, "আমার মনে হয়েছিল সে রাতে কিছু হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল। আমাকে তাড়াতাড়ি কলকাতা নিয়ে আসা হল। বলল রেকর্ডিং আছে। কিন্তু রেকর্ডিং ছিল না। পরের দিন বেলা অবধি ঘুমোল। লোকটা মদ খেলে এভাবে পাল্টে যেতো, চেনা লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে যেতো... ছি ছি ছি... ছি..."

উপমন্যু কিছু বললেন না। ক্লান্ত লাগছিল তার। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

৪৭

"কেমন একটা ক্যান্সারাস সমাজে থাকি না আমরা স্যার? একটা কেউ ভাল না এখন। অজয় দাসকে তো কিছুই করা গেল না। এসব লোক এত এত কুপ্রস্তাব পাঠিয়ে কেমন আনন্দে লোকসমাজে হাসতে হাসতে ঘুরে বেড়াবে। ভাবলেই গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে স্যার।"

গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন। লাহিড়ীর কথার উত্তরে বললেন, "রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অরুণবাবুর কথা ভাবো তবে। এত বড় শিল্পী, অথচ আদতে লোকটা কেমন? বৈপরীত্যের একটা সীমা পরিসীমা থাকা উচিত। ওর সেসব ছিল না। একদিকে অঙ্গীরা প্রত্যুষার বাড়ি করে দিচ্ছেন, ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, অন্যদিকে কখনো কারো কেরিয়র নষ্ট করলেন, নিজের বউয়ের বাড়ির বাইরে যাওয়া আটকে গেলেন, আর একটা রেপ..." মুখ ঘেন্নায় কুঁচকে উঠল তার।

লাহিড়ী বললেন, "মাঝখান থেকে আপনার হেমন্ত সুদটা পেয়ে গেল স্যার। আপনি হেমন্তকেও কিছু করতে পারলেন না। লোকের থেকে এত বাড়তি সুদ নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে মালটা"।

উপমন্যু বললেন, "শাইলক পালাতে পারবে না লাহিড়ী। শাইলকের শাস্তি হবেই। তবে সবাইকে সব শাস্তি দেওয়ার দায় আমাদের না, সেটা মাথায় রেখো"।

লাহিড়ী হতাশ গলায় বলল, "ছেড়ে দেবেন?"

উপমন্যু বললেন, "আমি ইনকাম ট্যাক্সে খবর দিয়েছি। হেমন্তর বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা ঠিক হবে। তুমি ভেবো না"।

লাহিড়ী খুশি হল, "তাহলেই হবে স্যার। আমি অন্তত কিছুটা হলেও শান্তি পাবো তাহলে"।

উপমন্যু বললেন, "একটা হেমন্ত ধরা পড়লে ওরকম দশটা হেমন্ত উঠে আসবে। এ কথা ভেবোই না যে তুমি বিন্দুমাত্র কিছু করতে পারবে। হেমন্তর মত পাবলিকদের থেকে টাকা নিতেও অনেক লোক বসে থাকে। আমার হেমন্তকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমি ভাবিও না। আমি দেখি প্রফেসরের মত সংবেদনশীল ভাল মানুষ, যিনি তার জীবনের আয়ের কতটা অংশ কিছুমাত্র না ভেবে অরুণকে লুকিয়ে দিয়ে এলেন। আমি ঋতুপর্ণাকে দেখি। নিজের দায়িত্ব নিঃশব্দে পালন করে গেছেন বরাবর। তবে ভুল মানুষে পরিশ্রম করে গেলেন, এই যা। আবার মনে হয় ভুল না হয়তো। হয়তো অরুণ ঠিক ছিলেন। বিয়েটা ভুল ছিল। জানি না, মানুষের মন বোঝা অত সোজা হলে ওই বিষয়ে কোন সাবজেক্ট থাকতো না তাহলে"।

লাহিড়ী বললেন, "মেয়েটার কথা আমার মাথাতেই আসে নি স্যার। আমি ভাবতেই পারি নি ওই চুপচাপ থাকা মেয়েটা এত নিঃশব্দে এত কিছু ভেবে বসেছিল"।

উপমন্যু সিগারেট ধরালেন, "রূপার কাজ ছিল প্রতিশোধ নেওয়া। সেটা ও নিয়েছে। মাঝখান থেকে কয়েকটা নর্দমার মুখ খুলতে সাহায্য করে গেল। আমরা দেখলাম নর্দমাগুলো আদতে কত নোংরা। যাক গে, আমার কাজ ফুরল। আশা করি এবার আমি নিশ্চিন্তে অবসর পরবর্তী জীবন কাটাতে পারবো। টেকনোলজি থাকায় আমার মত ফাঁকিবাজ গোয়েন্দারা কত অ্যাডভান্টেজ পেল ভাবো। এটাই যদি আগে কোন সময় হত, আমরা কী করে কনফার্ম হতাম মেয়েটা স্কুটি নিয়ে অরুণের বাড়ির মোড়ে ঢুকেছিল? যদিও প্রথমে আমার খটকা লাগে নি। মেয়েটা তো র‍্যাডারেই ছিল না। ভেবেছিলাম অন্য কেউ হতে পারে। কাল রাতে বাড়ি ফিরে শুয়ে আছি, হঠাৎ মনে হল, কেন? মেয়েটা হতে পারে না কেন? একবার ওকে ইন্টারোগেট করাই যাক। অত রাতেই আমি বেরোলাম, পৌঁছে দেখছি ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। মেয়েটা আমাকে জানলা

থেকে দেখেই বুঝেছিল আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে আসছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পট ডিসিশন নিয়ে নিল। একটা মানুষের মনে পুলিশ সম্পর্কে কতটা ভয় থাকলে সে এভাবে সুইসাইড করতে পারে ভাবো।"

হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন উপমন্যু।

লাহিড়ী বললেন, "তপোব্রতকে কি ক্যাসেটগুলো ফেরত দেবেন স্যার? আমাকে ফোন করছিলেন ভদ্রলোক"।

উপমন্যু বললেন, "কপি করে ফেরত দিয়ে দেবো। গানগুলো ভারি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের গান তো। রবীন্দ্রনাথ সবার জন্য। আমার জন্য, তোমার জন্য, রূপা সোরেনের জন্যও। মেয়েটা যে এই গানটার কথা মনে রেখেছিল, সেটাই আমায় অবাক করল। হোয়াট আ ওয়েস্ট অফ লাইফ লাহিড়ী। ছি ছি ছি"।

উপমন্যু নিঃশব্দে কাঁদছিলেন।

লাহিড়ী কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন...

#

ভোরবেলা।

সঙ্গীতা ঘরেই ছিলেন।

দরজা খুলে উপমন্যুকে দেখে চমকালেন একটু, "বলুন"।

উপমন্যু বললেন, "ঢুকতে দেবেন না?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন সঙ্গীতা।

উপমন্যু ঘরে প্রবেশ করে বসলেন।

সঙ্গীতা বললেন, "এত সকালে? খুনি তো ধরা পড়েছে অফিসার। এখন আমি কী করতে পারি আর?"

উপমন্যু বললেন, "ডাউট ক্লিয়ার করতে পারেন"।

সঙ্গীতা বললেন, "মানে?"

উপমন্যু বললেন, "আটলাখ টাকা দেনা ছিল অরুণের। হেমন্তের কাছে। অথচ ঋতুপর্ণা জানতেন দশ লাখ। কেন?"

সঙ্গীতা বললেন, "সেটা আমি কী করে জানবো? আপনি ঋতুপর্ণাকে জিজ্ঞেস করুন"।

উপমন্যু হাসলেন, "আপনি এবং অরুণ জানতেন ঋতুপর্ণা হেমন্তের টাকাটা ঠিক শোধ করে দিতো। তাই সুকৌশলে দেনাটা আসলে দশ লাখ, সেটাই ঋতুপর্ণার কানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তাই না?"

সঙ্গীতা বললেন, "জানি না। আপনি কি আমার কাছে কিছু চান? তাহলে বেডরুমে আসতে পারেন"।

উপমন্যু উঠে দাঁড়ালেন, "আসি ম্যাডাম। হেমন্ত আপনার নাম নিলে আবার আসবো না হয়"।

সঙ্গীতা অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উপমন্যু বাইরে এসে গাড়িতে বসলেন। লাহিড়ী বললেন, "বাড়ি নামিয়ে দেবো স্যার?"

উপমন্যু বললেন, "সে দিও। তবে লাহিড়ী, একটা ফ্যাক্ট তোমার জেনে রাখা ভাল"।

লাহিড়ী বললেন, "কী স্যার?"

উপমন্যু হাই তুললেন, "অম্বরের পুরো নাম অম্বর সরকার"।

লাহিড়ী চমকে উঠে বললেন, "মানে? অর্ণবের কেউ?"

উপমন্যু বললেন, "কাকার ছেলে"।

লাহিড়ী বললেন, "ও কি ইনভলভড ছিল?"

উপমন্যু বললেন, "রূপার ব্যাপারটা জানতে পারে। হয়তো রূপাকে হেল্পও করেছে"।

লাহিড়ী বললেন, "ধরবেন?"

উপমন্যু চুপ করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বললেন, “ধুস। তার থেকে নৈনিতালের ওয়েদার আপডেট দাও বরং। খুব ঠাণ্ডা কি? আমার আবার ঠাণ্ডা জায়গা ভারি ভাল লাগে। সোয়েটার গোছাতে হবে। চল চল, তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ি ছাড়ো তো। কতদিন পর নিশ্চিন্তে বেড়াতে যেতে পারবো বল তো...”

-শেষ-